বিধবা বিবাহ

"দেশের ডাক," "বিদ্রোহী আয়র্লণ্ড"

"আদর্শ," "সমাজ ও শাস্ত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীভবেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
সারস্বত কুঞ্জ
৮০।২ হ্যারিসন্ রোড্, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

যাঁহার স্নেহ-সিক্ত আশীর্ব্বাদ ও জীবন্ত প্রেরণা
আমাকে সমাজ ও দেশ সেবায় অনুপ্রাণিত
করিয়াছে আমার সেই মূর্ত্তিমান ব্রহ্ম-
দেবতা পরমারাধ্য
শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী পিতৃদেবের
শ্রীচরণ কমলে—
এই দীনপাত্র
প্রদত্ত হইল।

—সেবকাধম নরেন্দ্র।

নিবেদন।

দেশে একটা ভাবের বাতাস বহিতেছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, যাহারা রাজনীতি লইয়া খুব বেশী হল্লা না করিবে তাহারা যেন ঠিক ঠিক সমাজ বা জাতির নিকট মানুষ বলিয়া দাবী করিবার উপযুক্ত নয়। এই শ্রেণীর লোকের রাজনীতি ক্ষেত্রেও কোনো প্রকার গঠনমূলক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায় না—একটা বিশিষ্ট সঙ্কীর্ণ আওতায় ইহারা লালিত ও বর্দ্ধিত। এই বিশিষ্ট শ্রেণীর রাজনীতিকের আরো একটা বিস্ময়কব মতবাদ আছে: ইহাদের ধারণা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে দেশ ও জাতির কোনো প্রকার উন্নতিই সম্ভবপব নয়;—এই হিসাবে ইহারা একমাত্র রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাই অন্ততঃ বক্তৃতা বা লেখনীর মুখে প্রকাশ করে। রাজনীতি ছাড়া, সমাজ, ধর্ম্ম ও মন-রাজ্যের বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা যে রাজনৈতিক বিপ্লব অপেক্ষা কোন অংশেই কম আবশ্যকীয় নয়, বরং ধরিতে গেলে রাজনৈতিক বিপ্লবের যে ইহারাই জন্মদাতা—তাহা হয়, এই শ্রেণীর রাজনীতিকের ধারণার অতীত অথবা ধারণা থাকিলেও বিশেষ কোনো মত-লব হাঁসিল করিবার জন্যই এ মত প্রকাশ করিতে ইহারা অনিচ্ছুক।

সৃষ্টি ও স্থিতি যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম—প্রলয়ও ঠিক তেমনি। প্রলয় শুধু ধ্বংসই করে না—ভবিষ্যতে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সে জন্মও দেয়। এই প্রলয়েরই অপর

নাম বিপ্লব। বিপ্লব কাহারো স্তুতি-মিনতির অপেক্ষা রাখে না—সে আসে নিজের প্রয়োজনীয়তা হিসাব করিয়া। বিপ্লব আসে ক্ষুদ্রকে ধ্বংস করিতে—বৃহৎকে প্রতিষ্ঠা করিতে; অল্পের তৃপ্তি সে উপেক্ষা করে—ভূমার আনন্দ সে স্বীকার করিয়া লয়, ব্যষ্টির মঙ্গল সে চায় না—সমষ্টির সেবাই তার ধর্ম্ম।

প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া মানুষের সঙ্কীর্ণ বিধান যখন চিন্তা-রাজ্যের নায়ক হইয়া দাঁড়ায়, ঠিক তখনই কতকগুলি পরস্পর বিরোধী মতবাদ জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র বা ধর্ম্মের চিরন্তন যে গতিবেগ তাহাকে পদে পদে ব্যাহত করিতে থাকে—মনুষ্যত্বের সহজ সবল এবং চরম আদর্শকে বিকৃত ও অথর্ব্ব করিয়া তোলে। জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র বা ধর্ম্মের আত্মা কিন্তু এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লয় না—সে মনে-প্রাণে চাহিতে থাকে একটা পরিবর্ত্তন। চিন্তারাজ্যের এই যে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা,—সাবধানী পথিকের সতর্ক পাদ-ক্ষেপের মতো সন্তর্পণতা তাহাকে কোন ক্রমেই তৃপ্তি দিতে পারে না; তাই সে ক্রমেই হইয়া ওঠে উদ্দাম, উত্তাল ও ভয়ঙ্কর। বিপ্লব এই অবস্থারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ আজ মনে প্রাণে এই বিপ্লবকেই আবাহন করিতেছে। সমাজের প্রতি স্তরে যে আত্মঘাতী বিধান ও মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে—তিল তিল করিয়া ইহাকে অপসারিত করা যাইবে না—করিতে হইলে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রকৃতির মঙ্গল বিধানকে অগ্রাহ্য করিলেই বিপ্লবের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়। অন্যায, অবিচার

ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থ দূর করিতে বিপ্লব হয়তো ধ্বংসের রথে চড়িয়াই আসিবে, কিন্তু তাহার জন্য দায়ী কে? বিপ্লবের স্বষ্টিকর্ত্তা অত্যাচারী—অত্যাচারিত নয়—নিষ্পীড়ক—নিষ্পীড়িত নয়।

* * * *

বিপ্লবের এই প্রাকৃতিক ধর্ম্মই জাতিব প্রাণে শুদ্ধিব প্রয়োজনীয়তা জাগাইয়া দিয়াছে—অস্পৃশ্যতা বিদূরিত করিবার জন্য সমাজ আজ ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছে; আর বিপ্লবের এই ধর্ম্মকে স্বাকার করিয়াই হাজাব বছব পরে আবার নূতন কবিয়া জাতি আজ বিধবাব বিবাহ বিধানকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া সাদবে ববণ করিয়া লইতেছে।

ভাবতেব সত্যসন্ধ শাশ্বত ঋষিব আমোঘ আশীব্বাদ, লক্ষ লক্ষ বাল-বিধবাব অশ্রুসিক্ত কল্যাণ কামনা এবং মুষ্টিমেয় সংস্কারবিরোধী ব্যক্তিব অভিশাপ লইয়া বিধবা-বিবাহ প্রকাশিত হইল। অভিশাপই যাঁহাদেব আজ শ্রেষ্ঠ বাণী,—তাঁহাদেরও আজ আমরা বিদ্বেষ করিব না,—আজ মনে করিব—"গুরু-গঞ্জন-চন্দন-অঙ্গভূষণ।" জানি আমরা—এই অভিশাপই একদিন আশীর্ব্বাদরূপে আমাদের মস্তকে পুষ্প-বৃষ্টি করিবে।

মফঃস্বলে প্রচার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া বই ছাপানো যে কতখানি কষ্টসাধ্য তাহা ভুক্তভোগী না হইলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তাই সুধীগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা, পুস্তকের উদ্দেশ্য বুঝিয়া সাধারণ ভুল ভ্রান্তি উপেক্ষা করিবেন।

পরিশেষে, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার মুখ্য কারণ মনস্বী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিকতা। তাঁহার স্নেহস্পর্শ ব্যতীত "বিধবা-বিবাহ" আত্মপ্রকাশের স্পর্দ্ধা রাখিত না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার এই স্নেহের শুভ্রতাকে মলিন করিতে চাহি না। ইতি—

বেড়া, পাবনা
শুভ ১লা বৈশাখ
১৩৩৫ সাল

লেখক—

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের আদেশে এবং মুখ্যত মহাত্মা রামমোহন রায়ের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ভারতব্যাপী "সতীর চিতা" নির্ব্বাপিত হইল। সংস্কারক এবং অগ্রগামী পন্থী অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, শ্মশানের এই চিতা নিবাইয়া দিলেই বুঝি বা হিন্দুর বিধবা মাত্রেরই অনেকখানি দুঃখ কষ্টের লাঘব হইবে; কিন্তু কার্য্যত দেখা গেল, বাহিরের চিতা নির্ব্বাপিত হইলেও নিরুপায় হিন্দু-সমাজ রাজ-আইনের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করিল না বটে, কিন্তু বিধবা-হত্যার কদর্য্য উল্লাসের লালসা সে সংযত করিতে পারিল না—রুদ্ধ অক্রোশে হিন্দু-বিধবার বুকের মধ্যে অত্যাচার ও নির্য্যাতনেব দাবাগ্নি সে সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

সতী-দাহ-প্রথা রদ করিবার পূর্ব্বেও বিধবার প্রতি অসহ্য অত্যাচারের ক্রটী হয় নাই—কিন্তু তখন অবকাশ বেশী পাওয়া যাইত না। জোর জুলুম করিয়া একবার কোনো প্রকারে চিতায় উঠাইয়া দিতে পারিলেই হয়—তার পর তো আর সমাজকে কোনো কিছু করিতে হইবে না! সতীত্ব-মহিমায় মুখরিত হিন্দু-সমাজ পৈশাচিক অট্টহাস্যে শ্মশান ও দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া হিন্দু-সমাজের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দিল। গৃহকোণে হতভাগিণীর গর্ভধারিণী হয় তো একবার কাত-

য়াইয়া উঠিল,—শিশুপুত্র থাকিলে, অজ্ঞাতসারেই একবার 'মা' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—কিন্তু সে চীৎকার ও আর্ত্তনাদ শুনিবার অবকাশ সমাজের নাই—সমাজ তখন নারী-হত্যার বিভৎস উত্তেজনায় মাতাল! অন্তরীক্ষ হইতে বিশ্বমানবতা ঠিক সেই সময়েই মুহুর্মুহু শিহরিয়া উঠিতেছিল —আর সেই "সতীর" অন্তর্দেবতা অভিশাপের অগ্নি-দৃষ্টি লইয়া হিন্দু-সমাজ-বক্ষে হাহাকারের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

সতীদাহ-প্রথা রদ হইবার পর এই প্রত্যক্ষ উপায়ে নারী-হত্যার পথ রুদ্ধ হইয়া গেলেও, সমাজে নিত্য নূতন অত্যাচার প্রবর্ত্তিত করিতে সমাজপতিদের একদিনের বেশী দুইদিন সবুর করিতে হইল না; প্রতিদিন নিত্য নূতন অত্যাচারে ও নির্য্যাতনে হিন্দু-বিধবা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া স্বোয়াস্তিভরে সেই একমাত্র শ্রেয়ঃ এবং প্রেয় মৃত্যুকেই তাহারা আবার কামনা করিতে লাগিল। সে কামনার করুণ-ধ্বনি আজ পয্যন্ত হিন্দুব অন্তঃপুর হইতে গুমবিয়া গুমরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। হিন্দু-সমাজ সতী-প্রথা রদ হওয়ার পর ২৫ বৎসর এমনি করিয়াই নারীর উপর অত্যাচারের পীত চাবুক নির্ম্মম রূপেই চালাইয়াছে এবং আজ পয্যন্ত সে চাবুক সংযত হইল না।

হিন্দু-বিধবা প্রসঙ্গে সকলের প্রথমেই মনে পড়ে স্রষ্টার জীবনের প্রথম-সেই-ঘটনা-দুটীর কথা যার আঘাতে সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের মনে প্রতিকারের সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিয়াছিল। সম্মুখে প্রবীন বৃদ্ধ অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি

মহাশয় নতমস্তক-বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করিতেছেন তাঁহার নব পরিণীতা দ্বিতীয় পক্ষের বালিকা-বধূকে দেখিবার জন্য ; ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই স্বীকার করিতেছেন না। বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া পত্নীর নিকট লইয়া গেলেন এবং দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। ঘোমটা-খোলা-বালিকার মুখ দেখিবা-মাত্র ঈশ্বরচন্দ্র আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর কণ্ঠে রোরুদ্যমান বালকের কণ্ঠ হইতে শপথবাণী উচ্চারিত হইল—"এ ভীটায় আর কখনো জল স্পর্শ করিব না!"।

এই ঘটনার সমসাময়িক আর একটী ঘটনা ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিল। বিদ্যাসাগর জীবন চরিত প্রণেতা শ্রদ্ধেয় চণ্ডিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলি-তেছেন—"একবার গৃহে গিয়া শুনিলেন তাঁহাদের পরিচিত কোনো সম্ভ্রান্ত গৃহের বিধবা কন্যা সকলের অজ্ঞাতসারে কলঙ্কের পথে পদার্পণ করে। ইহার ফলস্বরূপ যখন তাহার সন্তান সম্ভাবনা হইল, তখন পিতা মাতা, মানসম্ভ্রম ও জাতি রক্ষার জন্য যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এরূপ অবস্থায় সচরাচর যে সকল উপায় অবলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা, এখানেও তাহার বিধি মত চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কোনো চেষ্টায় আশানুরূপ ফললাভ না হওয়াতে, যথাকালে সেই হতভাগিণী বিধবা এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল এবং আত্মীয় স্বজন ও সামাজিকগণের উৎপীড়ন ভয়ে ভীত গৃহ-

কর্ত্তা ও গৃহিণী, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে সেই সদ্য-প্রসূত শিশুকে হত্যা করিয়া কুল মান রক্ষা করিলেন।...... বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বলিতেছিলেন যে রাক্ষসী গৃহিণী সূতিকা-গৃহে স্বহস্তে সেই নিরপরাধ শিশুকে টিপিয়া মারিয়া ফেলিল, তখন তাঁহার চক্ষের জল ও মুখের লালা মিশ্রিত হইয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত করিতেছিল। সহসা মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, মনের গ্লানি ও যন্ত্রণার পরিচায়ক উত্তেজনা তাঁহার সমগ্র শরীরে প্রকাশ পাইল। অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রুজল মোচন করিয়া শেষে পরিধেয় বস্ত্রে মুখ মুছিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। একি মানুষের দেশ? মানুষের দেশ হইলে, এতদিন ইহার প্রতিবিধান হইত।"

এই সব ঘটনার পর প্রায় ১৯ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বালক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাবত্তা, শাস্ত্রজ্ঞান ও কর্ম্মদক্ষতায় তখন দেশের মধ্যে অন্যতম গণ্যমান্য ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। নিতান্ত দরিদ্র দশা হইতে পর্য্যাপ্ত অর্থ তাঁহার আয় হইতেছে; সমাজে প্রতিষ্ঠা, অপরিম্লান যশ, লোকের ব্যাজস্তুতি,—সাধারণ মানুষের উন্নতি বলিয়া যাহা কিছু বুঝা যায়—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ সবই করতলগত; কিন্তু চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের কোমল প্রাণে হিন্দু-সমাজের কঠোর ও হৃদয়হীন ব্যবস্থা নির্ম্মম আঘাতে যে ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল---সে গভীর ক্ষত সংসারের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিও নিরাময় করিতে পারিল না। সমাজের এই

নির্লজ্জ আত্মঘাতী ব্যবস্থার প্রতিকারকল্পে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন।

এই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কলেজের কার্য্য শেষ করিয়া অপরাহ্ণ হইতে সমস্ত রাত্রি তিনি কলেজের পুস্তকাগারে পুস্তকরাশির মধ্যে মগ্ন থাকিতেন। আহার-নিদ্রার কথা ভুলিয়া গেলেন,—দেহ-বোধ তাঁহার রহিত হইয়া গেল; শব-সাধনার সাধক একাগ্র তন্ময় চিত্তে নিজেকে ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া সাধনায় নিজেকে সমাহিত করিয়া ফেলিলেন। সিদ্ধি আসিয়া তাঁহার ললাটে দীপ্ত জয়শ্রী পরাইয়া দিল। দীর্ঘ সাধনার পর সাধক সিদ্ধির অমৃতস্পর্শে আত্মহারা হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন "পাইয়াছি, পাইয়াছি !!" বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি পাইয়াছ ? সিদ্ধ সাধক সফলতার অতুল্য আনন্দে সমুজ্জ্বল মুখভঙ্গিমায় উত্তর করিলেন,—"যাহার জন্য এতদিন এত ক্লেশ ভোগ করিতেছিলাম আজ তাহা পাইয়াছি। এই দেখ,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

উপকরণ সংগ্রহ হইল, অস্ত্রও প্রস্তুত হইল,—বীর বিদ্যাসাগর পিতা-মাতার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বাংলার জাতিয় ইতিহাসের ইহা এক নূতন অধ্যায় ও স্মরণীয় দিন। এই যুদ্ধ-সংঘর্ষের

ঘাত-প্রতিঘাতে যে অমৃতের উদ্ভব হইল—জাতির ভবিষ্যৎ জয়যাত্রার পথের উহাই হইল এক অব্যর্থ সম্বল।

কেহ কেহ মনে করেন বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বাংলা বা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ই আন্দোলন উপস্থিত করেন। প্রকৃত ঘটনা আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ও প্রচেষ্টা হইয়াছে। রাজা রাজবল্লভ তদানিন্তন সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্তে ও বিরুদ্ধাচরণে তাহা করিতে সমর্থ হন নাই। এই সম্বন্ধে ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে বিশদভাবে লিখিত আছে। *

বিদ্যাসাগর মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ক'লকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস (কর্ম্মকার) নিজের অষ্টম বর্ষীয় বালিকা বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের নিকট ব্যবস্থাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত ৺কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত মলঙ্গা নিবাসী দত্ত বাবুদের সভাপণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, রাজা কমলকৃষ্ণ দেবের সভাসদ্ ঠাকুরদাস চূড়ামণি ও হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সভাসদ্ বহুজ্ঞ পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মধুসূদন ও হরনাথ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি মহা মহা

* দেওয়ান কার্ত্তিকচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রণীত ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত ১৪৫, ৫৫, ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রজ্ঞ রথীগণ ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মিলিত হইয়া বিধবা বিবাহের বৈধতা স্বীকার করিয়া একখানি ব্যবস্থা-পত্র প্রদান করেন। উক্ত ব্যবস্থা-পত্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের নিজের রচিত ও স্বহস্তে লিখিত। কিছুদিন পর স্যর রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে আহূত এক বিচারসভায় বহুসংখ্যক অধ্যাপক সমক্ষে নবদ্বীপের তৎকালীন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত বিচারে স্বাক্ষরকারীগণের অন্যতম ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থনে জয়ী হইয়া রাজবাটীতে এক-জোড়া শাল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কিন্তু উক্ত পণ্ডিতপ্রবর কাজের বেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত শাল গায়ে দিয়া বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের সহায়তা করিয়াছেন। অন্যান্য পণ্ডিত পুঙ্গবও এই সহজ পথ অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবা বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—"শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ দাস বিষয়ী লোক, শাস্ত্রজ্ঞ নহেন। তিনি শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংশক জানিয়া তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাও সেই প্রার্থনা অনুসারে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। যদি বিধবা বিবাহ বাস্তবিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাঁহাদের বোধ থাকে, অথচ কেবল তৈল-বটের লোভে শাস্ত্রীয় বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে

যথার্থ ভদ্রের কর্ম্ম করা হয় নাই। আর, যদি বিধবা বিবাহ বাস্তবিক শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম বলিয়া বোধ থাকে এবং সেই বোধ অনুসারেই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয বলিয়া তদ্বিষয়ে বিদ্বেষ প্রদর্শন করাও যথার্থ ভদ্রের কর্ম্ম হইতেছে না।

যাহা হউক, আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহাদের এইরূপ রীতি, সেই মহাপুরুষেরাই এ দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসা কর্ত্তা, এবং তাঁহাদেব বাক্যে ও ব্যবস্থায় আস্থা করিয়াই এ-দেশের লোকদিগকে চলিতে হয়।"

শুধু বিধবা বিবাহ নহে, প্রত্যেকটী সংস্কার সম্বন্ধেই এ-দেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা হিন্দু সমাজের গভীব কলঙ্ক ও দূরপনেয় লজ্জার কথা। শ্রীচৈতন্যদেবেব সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত দেশের যে কোনো সংস্কারেব বিরুদ্ধে ইহারা শুধু মতবাদ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, পরন্তু নানা নীচ উপায় ও ঘৃণ্য কর্ম্ম পদ্ধতি গ্রহণ করিতেও ইহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই। বর্ত্তমান সমাজ যে ইহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে ইহার মূলে একটী গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। অমন প্রেমের পাগল শ্রীচৈতন্যকেও ইহারা সাতঘাটের জল খাওয়া-ইতে ছাড়েন নাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভগবান শঙ্করের নাম লইয়া গর্ব্ব করেন কিন্তু তাঁহারাই ভুলিয়া যান যে এই সম্প্রদায়ের দাপটেই সাক্ষাৎ শঙ্কর শঙ্করাচার্য্যকেও একাকী তাঁহার মায়ের সৎকার করিতে হইয়াছিল।

তার পর রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণানন্দ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি দেশের ও সমাজের একনিষ্ঠ সেবকদের প্রত্যেককেই ইঁহাদের হস্তে নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছে। এই নির্য্যাতনের হস্ত হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও নিষ্কৃতি পান নাই।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার লক্ষ্যভেদ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন এবং এই বিধবা বিবাহের অনুকূলে শাস্ত্র মত সমন্বিত মহাস্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আলোড়িত করিয়া তুলিল। কত শত পণ্ডিতপ্রবর স্বনামে ও বিনামায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিবাদ করিলেন। কটূক্তি, তীক্ষ্ণবাক্য, ব্যক্তিগত কুৎসা, ও আক্রোশের জ্বালাময়ী আঘাতের ভিতর সেদিন সহস্র রথী পরিবেষ্টিত এই পুরুষসিংহ যে অমিত তেজ, অবিচলিত নিষ্ঠা, ও ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। প্রতিভা-প্রদীপ্ত ঊনবিংশশতাব্দীর এই অভিমন্যু যেদিন আপন সংযম ও সহিষ্ণুতার দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া সুসঙ্গত শাস্ত্র ব্যাখ্যার পরাকাষ্ঠায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মিথ্যা যুক্তিজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মেঘমুক্ত সূর্য্যের মতোই বাংলার সামাজিক জীবনে আত্মপ্রকাশ করিলেন—সে দিন সত্য সত্যই মহা-ভারতের পুনঃসংস্করণ আরম্ভ হইল।

প্রতিপাদ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কুটূক্তি, বিদ্রূপ ও মলিন রহস্যের আশ্রয়ে যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে গভীর পরিতাপের সহিত তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—"কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে সকল মহাশয়েরা উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কি প্রণালীতে এইরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা বিশিষ্ট-রূপে অবগত নহেন। কেহ কেহ বিধবা বিবাহ শব্দ শ্রবণ মাত্রেই ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়াছেন এবং বিচার কালে ধৈর্য্য লোপ হইলে, তত্ত্ব নির্ণয় কল্পে যে অল্পদৃষ্টি থাকে, অনেকের উত্তরেই *তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে*।......বিষয়ী লোকেরা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন; সুতরাং সংস্কৃত বচনের স্বয়ং অর্থগ্রহ ও তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারেন না। তাহাদের বোধার্থে ভাষায় (বাংলা) অর্থ লিখিয়া দিতে হয়। সেই অর্থের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহারা তথ্যাতথ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই সুযোগ দেখিয়া অনেক মহাশয়ই স্বীয় অভিপ্রেত সাধনার্থে, অনেক স্থলেই স্ব স্ব ধৃত বচনের বিপরীত অর্থ লিখিযাছেন এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গও তাঁহাদের লিখিত অর্থকেই প্রকৃত অর্থ বলিয়া স্থির করি-য়াছেন।......

অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে উত্তর দাতা মহাশয়-দিগের মধ্যে অনেকেই উপহাসরসিক ও কটূক্তিপ্রিয়। এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারের প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্ব্বে আমি অবগত ছিলাম না।......

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহার উত্তরে যে পরিমাণে

পরিহাস বাক্য ও কটূক্তি আছে, তাহার উত্তর সেই পরিমাণে অনেকের নিকট আদরনীয় হইয়াছে।......*

এই প্রকার বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতীয় হিন্দু সমাজের মূল ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিলেন। চারিদিকে একটা নূতন জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিবাহকে আইনসিদ্ধ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর ও তদীয় ভক্তমণ্ডলী উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সহস্র সহস্র আবেদন রাজদ্বারে পৌঁছিতে লাগিল। কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেব এবং দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ব্যতীত সকলেই এই অভিযানকে সমাজের পরম কল্যাণ কর বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইল।

পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা সেদিন ধীরচিত্তে সমাজ ও জাতির উত্থান-পতন লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহারা পিছাইয়া পড়িয়া থাকিলেন না। ইঁহাদের অগ্রণী হইলেন,—পণ্ডিতাগ্রগণ্য তারানাথ তর্কবাচস্পতি। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার, তিলকচন্দ্র তর্কালঙ্কার, দুর্গাদাস চূড়ামণি, কেশবচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রাজারাম ন্যায়রত্ন জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (সংস্কৃত কলেজ) মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যানিধি, রামরতন বিদ্যালঙ্কার, ব্রজমোহন বিদ্যাবাগীশ, প্রিয়নাথ সিদ্ধান্ত-পঞ্চানন, রামমাণিক্য তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি বহুসংখ্যক সুধী এবং উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,

* বিদ্যাসাগর প্রণীত "বিধবা বিবাহ" ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি সমাজপতিগণ একবাক্যে এবং সর্ব্বথা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমর্থন করিয়া রাজদ্বারে আইন পরিবর্ত্তিত করিতে আবেদন করিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপ চাঁদ ও নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, ঢাকার জমিদার ও ধনী হিন্দুগণ, মৈমনসিংহের জমিদারগণ অনেকেই এই অভিযানের সহায়তা করিলেন। প্রায় ২৫ হাজার লোক সমবেত হইয়া উপর্যুক্ত আইন প্রণয়নের প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন করায়, সারা বাংলা জুড়িয়া এক বিরাট আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, এবং এই আন্দোলনের ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। একনিষ্ঠ সাধক জাতির জয়-যাত্রার পথে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া দিলেন,—

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই।

আইন পাশ হইবার পরেই সমগ্র বাংলা দেশে বিধবা বিবাহের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত-পুঙ্গবগণের অগ্নিশ্রাবী অভিশাপ, সমাজপতিগণের স্বার্থ-গন্ধময় ভ্রূকুটী ও আত্মীয় স্বজনের চোখরাঙানী—সব উপেক্ষা করিয়া নূতন বাংলার যৌবন অকস্মাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। জাতির অগ্রদূত ও নূতন পুরোহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐকান্তিক সাধনায় এবং বিপুল উদ্যমে খাটুরা গ্রাম নিবাসী সুবিখ্যাত রামধন তর্কবাগীশের পুত্র এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পলাসডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় দশম-বর্ষীয়া বিধবা কন্যার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। এই বিবাহে

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ, হরেন্দ্র ঘোষ, শম্ভূচন্দ্র পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি বিদ্যাসাগর বন্ধু-মণ্ডলী সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

এইরূপে বাংলার ইতিহাসের এক নূতন পর্ব্বের সূচনা হইল। হিন্দু-সমাজের প্রত্যেককে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা উচিত সমাজের আবর্জ্জনা ও মহাপঙ্ক অপসারিত করিয়া যাঁহারা ইহাকে সম্পদে ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া জগতের সম্মুখে জাতির পরিচয় প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম,—

৺শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
ও
৺কালীমতী দেবী

শাস্ত্রমতে বিচার করিয়াই বিরুদ্ধ পক্ষ ক্ষান্ত হইল না; নানা প্রকারেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাহারা শত্রুতা সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইল। একদিকে জলস্রোতের মতো তাঁহার অর্থ এই কাজে ব্যয়িত হইতে লাগিল— যাহারা সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহারা কাজের সময় অনেকেই পেছপাও হইয়া গেল; কিন্তু সহস্র বাধা ও বিপত্তি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া এই তরুণ বাংলার অন্যতম শ্রষ্টা অমিত বিক্রমে অগ্রসর হইয়াই

চলিলেন। ইহাই প্রকৃত চরিত্রের অভিব্যক্তি। তথাকথিত সাত্ত্বিকতার দোহাই দিয়া সংসারে সহস্র প্রকার সীমা ও গণ্ডী টানিয়া যাহারা বাস করিতে অভ্যস্ত তাঁহারা হয়ত ইহা স্বীকার করিতে চাহিবেন না;—কিন্তু মানবতার মাপকাঠিতে দোষ বা ভুলের আধিক্যই চরিত্রের নিয়ামক বলিয়া কোনো দিনই নির্দ্ধারিত হয় নাই; একমাত্র দুর্দ্দম গতিবেগ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাই মনুষ্যত্ব ও চরিত্রের তুলাদণ্ড। (That can cleave through adamantine walls of difficulties—Vivekananda) এই অমোঘ চরিত্রের অধীকারী বিদ্যাসাগর বাংলাকে নূতন করিয়া গঠন করিতে যাইয়া মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ ব্যক্তিগত কুৎসা রটাইয়া, কটূক্তি ব্যবহার করিয়া এবং আরো নানা প্রকারেই তাঁহাকে বিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াও পরিতুষ্ট হইল না—অবশেষে তাঁহার প্রাণ সংহারের জন্য গোপনে আয়োজন চলিতে লাগিল। বিধবা বিবাহের আন্দোলনরূপ বৃহৎ বন্যায় যখন সমগ্র দেশ ভাসিয়াছে, সেই সময় একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সংস্কৃত কলেজ হইতে বাসায় আসিবার সময় ঠনঠনিয়ার কালী তলায় দেখিলেন, কয়েক জন লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিবার মানসে অগ্রসর হইতেছে। মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে তাঁহার জীবন লীলা শেষ হইবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের এক মহাপুরুষের অকালে গোপনে শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই ভীমকায় শত্রুদের সমাগমে তিনি ভীত কিংবা চিন্তিত হইলেন না,

কেবল একটিবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কইরে ছিরে, সঙ্গে আছিস্ কি" ? পিতা ঠাকুরদাস এই প্রকার আয়োজনের কথা শুনিয়া তাঁহাদের বাড়ীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল শ্রীমন্তকে বিদ্যাসাগবমহাশয়ের দেহবক্ষী কবিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমন্ত পশ্চাৎ হইতে বলিল, "তুমি চল না, কে আসে যায়, সে আমি দেখব, তুমি চলে যাও, চাকর সঙ্গে আছে"। শ্রীমন্ত যে উত্তর করিল তাহা শুনিয়া আক্রমণ কাবিরা তৎক্ষণাৎ বুঝিল যে বিদ্যাসাগর সুরক্ষিত হইয়া চলিয়াছেন, আর একটী পাও অগ্রসর হইল না ; যে যতদূব আসিয়াছিল, সেইখান হইতে ক্রমে পশ্চাদপদ হইল। *

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে তাঁহার উৎসাহ আবো শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। এবং একএক করিয়া অনেকগুলি বিবাহ নিজের উদ্যোগে সম্পন্ন করিলেন। এই সমস্ত বিবাহে বিদ্যাসাগরমহাশয় স্বেচ্ছায় নিজের পকেট হইতে এতো অধিক পবিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন যে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এবং এই অজস্র অর্থ ব্যয়ে তিনি ক্রমেই বহুল ঋণদায়ে জড়িত হইয়া পড়িলেন। বর্ত্তমান বাংলার কর্ম্মীদের ইহা এক শিক্ষণীয় অধ্যায়। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার করেন নাই ; পরন্তু এই সমাজ সংস্কার ব্রতে দীক্ষিত হইয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, অনিবার্য্য বিপদ কোনোদিনই তাঁহাকে

* বিদ্যাসাগর জীবনী—চণ্ডিচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৪—৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সঙ্কল্প বিমুখ করিতে পারে নাই; বাধা ও বিপত্তি তাঁহার ঐকান্তিকতাকে আরো শতগুণ সমুজ্জ্বল করিয়াছে। ইহাই বিদ্যাসাগর-জীবনের এক মহামূল্য নীতি।

বিধবা বিবাহ তাঁহার প্রাণের কত বড় যে সাধনা ছিল, একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়। নিজেকে বাঁচাইয়া, সমাজের চোখ রাঙ্গানীকে গোপনে গোপনে সমর্থন করিয়া কোনোদিনই তিনি কোনো কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার লক্ষ্য ছিল নির্ভিক ও অটল; কার্য্য ছিল শানিত তরবারির মতো তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। লক্ষ্য ও কার্য্যের এ সামঞ্জস্যই তাঁহাকে সর্ব্ব-কার্য্যে জয়যুক্ত করিয়াছে। নারায়ণচন্দ্রের বিবাহের পর তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে যে পত্র খানি লিখিয়াছিলেন তাহা দেখিলেই তাঁহার মতবাদ ও ত্যাগ--স্বীকারের গভীরতা সম্বন্ধে সবিশেষ ধারণা হইবে।

শ্রীশ্রীহরি শরণং

শুভাশিষঃ সন্তু—

২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ

করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে.....................আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্ব প্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি; সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবা বিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সেজন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ ; অস্মদীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১শে শ্রাবণ।

শুভাকাঙ্খিণঃ

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র শর্ম্মণঃ

এই পত্রের প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রকৃত মানুষটির রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাই বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার সফলতাময় জীবনের গোপন ইতিহাস। ইহাকে যে বুঝিতে পারিবেনা বিদ্যাসাগরকেও সে চিনিতে সমর্থ হইবেনা—যৌবন শ্রী উদ্ভাসিত নূতন বাংলার গঠন ইতিহাস তাহার দৃষ্টির অন্তরালেই থাকিয়া যাইবে।

— —

বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না।

১।

বাংলার পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর ও লাহোরের দানবীর মহাপ্রাণ স্যর গঙ্গারাম, এই দুই নৈষ্ঠিক সাধকের অপরিমেয়

ঐকান্তিকতার ফলে বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ ও দেশের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে কিন্তু আশানুরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিতেছে না। সমাজের অসহ্য ভণ্ডামী, অন্ধ সংস্কার এবং, দাসসুলভ মনোবৃত্তিই ইহার একমাত্র কারণ। সমাজ শরীরে যেদিন সত্য সত্যই প্রাণ ছিল, সেদিনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—আজ সমাজে যাহা অসম্ভব বোধ হইতেছে,—সেদিন তাহা সহজ সাধ্য ছিল,—আজ যাহা অন্যায় এবং অকর্ত্তব্য বিবেচিত হইতেছে, সে দিন তাহা শুধু ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা নহে—একান্ত অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য এবং সমাজের ধর্ম্ম বলিয়াই জন সমাজে আদৃত হইত। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষ যখন সুস্থ ও সবল থাকে—বিচার করিয়া সে আহার ও বিহার করেনা,—আইন ও বিধানের গণ্ডী টানিয়া প্রতি পদে পদে তাহার গতিবেগকে ব্যাহত করিতে চায় না। পরিপূর্ণ আনন্দ ও উচ্ছল লীলায়িত ছন্দকেই সে জীবনে বরণ করিয়া লইতে চায়। বরং একটু আধটু উচ্ছৃঙ্খলতাকে সে মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকে—কিন্তু মৃতকল্প স্থানুর জীবন সে দুর্ব্বহ বলিয়াই মনে করে। সমাজের এই রূপ আমাদের ও ছিল; কিন্তু কর্ম্মদোষে আমরা তাহা হারাইয়াছি। পঙ্গু ও অথর্ব্ব সমাজ দেহের তাই প্রতি অঙ্গ হইতে কদর্য্য ক্লেদাক্ত ক্ষত ফুটিয়া বাহির হইয়াছে;—তাই, আজ সব ছাড়িয়া—সব পথ্য ও পাণীয়ের কথা ভুলিয়া গিয়া, বিচার্য্য হইয়াছে, এই মরণোন্মুখ দেহের কণ্ঠে জল চলিবে কিনা? রোগীর

এই দশা দেখিয়া মাসী-পিসীর দল, আকুল আৰ্ত্তনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে—কেহ কেহ শেষ-কার্য্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতেও ত্রুটী করে নাই, কিন্তু জীবন-মরণ ভাঙ্গন-গড়ন লইয়াই যাঁহাদের কারবার, ক্ষতের উপর নির্ম্মম অস্ত্রোপচার করিয়া যাঁহারা রোগীকে নিরাময় করিতে চান—কণ্ঠ জল চালাইবার সামর্থ্য না রাখিলেও গা ফুটা করিয়া যাঁহারা রক্ত চালাইয়া থাকেন—তাঁহারা অবিচলিত কণ্ঠে ব্যবস্থা দিয়াছেন, এ রোগী মরিতে পারে না।—ঐ পদিপিসীর দলই নিজেদের অজ্ঞতা ও শুচিতার অত্যাচারে ইহাকে মরণের পথে লইয়া গিয়াছে। ঐ আওতা হইতে সর্ব্বাগ্রে রোগীকে সরাইয়া আন, শুচিতার বলাৎকার (?) হইতে রোগীকে উদ্ধার করিয়া খানিকটা মুক্তির স্বাদ ওকে সম্ভোগ করিতে দাও—দেখিবে রোগী আপনাআপনিই রোগমুক্ত হইয়া উঠিবে।

হিন্দু সমাজের গত পোনের শত বৎসরের ইতিহাস ইহাই। একদিকে অজ্ঞ ও সংস্কারের দাস তথাকথিত সমাজের কয়েকজন 'পতি' ক্রমাগত ইহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র—অন্যদিকে পরিপূর্ণ ভগবদ্-শক্তি সম্বল করিয়া সাধনা ও অভিজ্ঞতার প্রজ্ঞা লইয়া কতিপয় তথাকথিত বিদ্রোহী জাতির ভিতর আত্মপ্রকাশ করিতেছেন যাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কাজ ঐ 'পতি'দের পাঁতিকে উপেক্ষা দেখাইয়া সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা। সংঘর্ষই নাকি জীবনের লক্ষণ। তা যদি সত্য হয়, এ জাতির উত্থান অনিবার্য্য।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-বিদ্রোহী বিদ্যাসাগর এই প্রয়োজনেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। মানবতার দোহাই, যুক্তি, প্রমান কিছুতেই তিনি সমাজের বিধাতাদের বিচলিত করিতে পারেন নাই; অবশেষে তাঁহার তীক্ষ্ণ কঠোর অস্ত্রাঘাতে বীর পুঙ্গবেরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল সত্য কিন্তু পরাজয় স্বীকার করে নাই—এবং নিশ্চিহ্ন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা করিবেও না। বড় দুঃখেই বিদ্যাসাগরমহাশয় বলিয়াছিলেন,—"হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে! তুমি যে সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মলোপকর জাতিভ্রংসকর বলিয়া ভূয়োভূয় নির্দ্দেশ করিতেছ, যাহারা সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে, তাহারাও সর্ব্বত্র সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে; আর তুমি যে কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ, অনুষ্ঠান দূরে থাকুক তাহার কথা উত্থাপন করিলেই এককালে নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, অর্ব্বাচীনের শেষ হইতে হইতেছে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে বহুবিধ দুর্নিবার পাপপ্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তোমার প্রতি অনাদর ও লৌকিক রক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।"

ঠিক এই কারণেই মনে হয়, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইয়া লাভ হইবে কি এবং কতখানি? শাস্ত্রের মর্য্যাদা যাহারা স্বেচ্ছায় পদদলিত করিয়া থাকে, পদে পদে নিজের সুবিধা ও স্বার্থসিদ্ধির সময় যাহারা শাস্ত্রকে অশাস্ত্ররূপে এবং অশাস্ত্রকে

শাস্ত্র বলিয়া লাভ-লোকসানের বেশাতি করিতে অভ্যস্ত, ব্যবহারিক জীবন ও শাস্ত্রের সহিত যাহাদের কণামাত্র সঙ্গতি লক্ষিত হয় না—তাহাদের নিকট শাস্ত্রীয় প্রমাণের মূল্যই বা থাকে কতটুকু, আর থাকিলেই বা তা স্বীকার করিবার মতো স্পর্দ্ধা আছে কয়জনের? কিন্তু তবুও শাস্ত্রের প্রমাণ দিতেই হইবে।—কেননা সংস্কৃত শ্লোক না বলিলে সব কিছু যুক্তি ও প্রমাণই হিন্দু-সংস্কারের নিকট ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আরো একটা কথা; যাহারা সংস্কার ও অগ্রগমনপন্থী, তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন—হিন্দুর শাস্ত্র অনুদার অথবা সঙ্কীর্ণ নহে। শুধু ব্যক্তিবিশেষের হস্তে পড়িয়াই ইহার বর্ত্তমান দশা ঘটিয়াছে।

হিন্দু-শাস্ত্র বিধবা বিবাহের সম্পূর্ণ অনুকূলে।

হিন্দু-শাস্ত্রের মতো উদার ও সমাজ-কল্যাণকর শাস্ত্র পৃথিবীর আর কোনো সমাজ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। একদিকে বহু মত ও বহু পথ স্বীকার করিয়া হিন্দু-শাস্ত্র যেমন বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছে ঠিক সঙ্গে সঙ্গে সমাজ রক্ষা কল্পে যুগে যুগে সৃষ্টিলীলার অপরিহার্য্য অঙ্গ ভাঙ্গন-গড়নকেও সে কোনোদিনই অস্বীকার করে নাই। অর্থাৎ পূর্ণ মানবত্ব লাভ করিতে যে পরিমাণে পরিবর্ত্তণ ও স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন, সে পরিপূর্ণ রূপেই ব্যষ্টিকে তাহা দিয়াছে। বর্ত্তমান শাস্ত্রজ্ঞ-

-গণ নিজেদের সুবিধাবাদ ও স্বার্থ অখণ্ড বাখিতে যতদূর পারিয়াছেন ইহাকে বিকৃত ও কদর্থ করিয়া সমাজ মধ্যে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; কিন্তু বিধির বিধান এ-হেন ব্যবস্থাতেও বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচারনৈপুণ্য এবং তাঁহাব ক্ষণজন্মা প্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশ যদি কেহ উপভোগ করিতে চান, তৎপ্রণীত 'বিধবা বিবাহ' পাঠ করিলে তাহা তিনি নিঃসন্দেহে পারিবেন; পরন্তু অন্যদিকে আমাদের দেশেব তথাকথিত শাস্ত্র ও ভগবানের "সোল এজেন্ট" বলিয়া অহবহ যাঁহারা দাবী করিয়া থাকেন তাঁহাদের বিচারের অসারতা, অযৌক্তি-কতা এবং অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও শ্লেষের ইঙ্গিত দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিতও কম হইবেন না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, হিন্দু-শাস্ত্র কোনোদিনই অন্যান্য শাস্ত্রের মতো একটানা একটা বাঁধা-ধরা গণ্ডীর ভিতর দিয়া ব্যক্তিকে চালাইবার প্রয়াস পায় নাই। যুগভেদে ইহার শাস্ত্র পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত এবং পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। ভগবান মনু বলিতেছেন :—

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃনাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥ ১।৫৮

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তিহ্রাস হেতু সত্যযুগের ধর্ম্ম অন্য; ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম অন্য; কলিযুগের ধর্ম্ম অন্য।

সত্যযুগের শাস্ত্রমত, মানুষের ক্ষমতায় কুলাক আর না কুলাক কলিযুগেও তাহা চালাইবার চেষ্টা করিতে হইবে ;—স্থান, কাল এবং পাত্র ভেদ না মানিয়া দেশের অবস্থা বিচার না করিয়া সংস্কৃত শ্লোকের বোমা-পিস্তলের আঘাতে মানুষকে চেষ্টা করিতে হইবে ক্রমাগত বুঝাইতে যে ইহাই তোমার শাস্ত্রমত—আর তাহা স্বীকার না করিলেই নরকবাসের ব্যবস্থা বা ঘোর কলির আগমন স্বপ্ন দেখিতে হইবে —এতো বড় গভীর তত্ত্বজ্ঞান আজকাল যে কোনো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের থাকে থাকুক,—কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিদের যে ছিল না—ইহা শপথ করিয়াই বলা চলে।

ইহার পরই দেখা যায় পরাশর সংহিতার প্রথমেই মহর্ষি পরাশর বলিতেছেন :—

> কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
> দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরা স্মৃতাঃ॥

মনুনিরূপিত ধর্ম্ম সত্য যুগের ধর্ম্ম, গোতম নিরূপিত ধর্ম্ম ত্রেতা যুগের ধর্ম্ম, শঙ্খ-লিখিত নিরূপিত ধর্ম্ম দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম, পরাশর নিরূপিত ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম।

এই "কলৌ পারাশরাস্মৃতাঃ" লইয়া বহু বাদ-বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। বস্তুত একটা কথা বলিলেই চলিবে ; কলিকালের জন্য পরাশর ঋষি নিরূপিত ধর্ম্মই মুখ্যত গ্রাহ্য ; অন্যান্য ঋষি নিরূপিত যে-যে ব্যবস্থা ও বিধান পরাশরের অবিরোধী, তাহাও গ্রাহ্য হইবে। কাজেই মনু, গৌতম, নারদ, ব্যাস,

শঙ্খ, লিখিত প্রভৃতি যুগাচার্য্যগণ যে-যে অংশে পরাশরের বিধান অগ্রাহ্য করিয়াছেন অথবা বিরুদ্ধ ভাবের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, কলিকালের লোক-সমাজ ধর্ম্মত তাহা পালন করিতে বাধ্য নয়।

ইহার পর বেদ, স্মৃতি, পুরাণ-কর্ত্তা ভগবান ব্যাসদেব তাঁহার সংহিতায় লিখিতেছেন,—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥ ৯

যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দৃষ্ট হইবে তথায় বেদই প্রমান; আর স্মৃতি ও পুবাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রমাণ। অর্থাৎ যদি একই বিষয়ে বেদে এক প্রকার স্মৃতিতে আর এক প্রকার এবং পুরাণে অন্য প্রকার ব্যবস্থা থাকে এবং উক্ত ব্যবস্থা যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তবে সেই স্থলে সর্ব্বাগ্রে বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ; তারপর স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইলে, সেখানে স্মৃতির বিধানই গ্রাহ্য হইবে।

বর্ত্তমান প্রতিপাদ্য বিষয়, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা? পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরাশরের বিধানই কলিকালের মুখ্য ধর্ম্ম। পরাশর ঋষি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত।

পরাশর ঋষির এই যে বচন ইহার অন্য অর্থ হয় না। ইহার ভিতর যে শব্দগুলি আছে তাহার একটীও দ্ব্যর্থবাচক নহে। অবশ্য ইহা সাধারণ লোকও আজকাল জানিতে পারিয়াছে যে সংস্কৃত ভাষার নানাপ্রকার অর্থই ব্যাকরণের কলে ফেলিয়া বাহির করা যাইতে পারে, কিন্তু কতকগুলি জিনিষ আছে যাহার পারম্পর্য্য ও সঙ্গতি দেখিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। পরাশরের ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য এই শ্লোকটীর অর্থ করিতে যাইয়া বলিতেছেন :—

"পরিবেদনপর্য্যাধানয়োরিব স্ত্রীণাং পুনরুদ্বাহ-
স্যাপি প্রসঙ্গাৎ ক্বচিদভ্যনুজ্ঞাং দর্শয়তি"—

(পরাশর) পরিবেদন ও পর্য্যাধানের ন্যায়, প্রসঙ্গক্রমে, কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দেখাইতেছেন—

ভাষ্যকার ও ঋষির বচন মিলাইলেই আর কোনো তর্কের সুযোগ থাকেনা; কিন্তু আমাদের দেশের শাস্ত্রজ্ঞগণ হটিবার পাত্র নহেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন ঘরভাঙ্গা বিভীষণের মতো তাঁহাদেরই দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় বিপক্ষ দলে যোগদান করিয়া ঘরের কথা সবই প্রকাশ করিয়া দিতেছেন—তখন ক্ষিপ্তপ্রায় পণ্ডিত-মণ্ডলী

পুঁজি-পাটা বগলে করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন,—'যুদ্ধং দেহি'। অর্থাৎ পরাশর যাহা বলিয়াছেন তাহা অতীব সত্য আবার ইহাও পরম সত্য যে পরাশর বিবাহিতা নারী সম্বন্ধে উক্ত বচন প্রয়োগ করেন নাই; একমাত্র বাগ্দত্তা কন্যার বর যদি অনুদ্দেশাদি হয়, তবেই উক্ত বিধানানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। পণ্ডিত মহাশয়গণ নিজেদের জিদ্ বজায় রাখিতে বহুতর কষ্টকল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই বচনের মধ্যে "বাগ্দত্তা" শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু তাতে কি আসে যায়?—গরজ বড়ই বালাই,—এই অর্থ প্রচার না করিলে যে হিন্দু-ধর্ম্ম রসাতলে যায়; সমাজ, অসুর ও পিশাচের বাসস্থান হইয়া ওঠে! পতিতপাবন "এজেন্টগণ" থাকিতে ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে তাঁহাদের নামে যে কলঙ্ক স্পর্শ করে; কাজেই প্রাণ থাকিতে ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে তাঁহারা কিছুতেই দিবেন না।

কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িয়া উঠিল। পরক্ষণেই আর একটী শ্লোক পাওয়া গেল। উহা দেবর্ষি নারদ বিরচিত নারদ সংহিতায় দৃষ্ট হইতেছে :—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ॥

ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদ্ প্রসূতা সমাত্রয়ম্।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বে বর্ষে ত্বিতরা বসেৎ ॥
ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিত যোষিতাম্।
জীবতি শ্রূয়মাণে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ ॥
অপ্রবৃত্তৌ তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোঽন্যগমনে স্ত্রীণামেষ দোষো ন বিদ্যতে ॥
—নারদ সংহিতা, দ্বাদশ বিবাদ পদ।

এই শ্লোকের অর্থ করিবার পূর্ব্বে নারদ সংহিতার একটু বিবরণ দিব।

নারদ সংহিতার প্রথমেই লিখিত আছে যে ভগবান্ মনু প্রজাপতি, সর্ব্বভূতের হিতার্থে, আচাররক্ষার হেতুভূত শাস্ত্র করিয়াছিলেন। সেই শাস্ত্র, লক্ষ শ্লোকে রচিত। মনু প্রজাপতি সেই শাস্ত্র সহস্র অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়া, দেবর্ষি নারদকে দেন। দেবর্ষি, মনুর নিকট সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বহুবিস্তৃত গ্রন্থ মনুষ্যের অভ্যাস করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সার সংগ্রহ করেন। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ তিনি ভৃগুবংশীয় সুমতিকে দেন। সুমতি দেবর্ষির নিকট অধ্যয়ন করিয়া এবং আয়ুহ্রাস সহকারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হইতেছে দেখিয়া, চারি সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সার সংগ্রহ করিলেন। মনুষ্যেরা সেই সুমতিকৃত মনুসংহিতা অধ্যয়ন করে। দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিরা লক্ষ শ্লোকময় বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করেন।* ইহা হইতে স্পষ্টই লক্ষিত

* ভগবান্ মনুঃ প্রজাপতিঃ সর্ব্বভূতানুগ্রহার্থমাচারস্থিতিহেতুভূতং শাস্ত্রং চকার।

হইতেছে যে নারদ সংহিতা ও মনুসংহিতায় মূল বিষয়ের কোনো বিরুদ্ধ ভাব থাকিতেই পারে না; কেননা নারদ সংহিতা ও মনুসংহিতা প্রকৃতপক্ষে একই গ্রন্থ। পরাশরের ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যও ইহা স্বীকার করিয়া 'নষ্টেমৃতে' প্রভৃতি বচনকে মনুবচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার পর মনুসংহিতা বিধবা বিবাহ সমর্থন করিতেছেন না, ইহা বলা কোনো ক্রমেই আর সঙ্গত হইবে না।

এইবার পূর্ব্বোদ্ধৃত নারদ-সংহিতার বচনের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল।

"স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র বিহিত, স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, ব্রাহ্মণ জাতীয় স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবে; অপুত্রবতী হইলে চারি বৎসর অপেক্ষা করিয়া তারপর বিবাহ করিবে। ক্ষত্রিয়া জাতীয়া স্ত্রী ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবে; অপুত্রবতী হইলে তিন বৎসর। বৈশ্যা জাতীয়া স্ত্রী সন্তানবতী হইলে চারি বৎসর অপেক্ষা করিবে; নতুবা দুই বৎসর। শূদ্র জাতীয়া স্ত্রীর প্রতীক্ষার কাল নিয়ম নাই; অনুদ্দেশ হইলেও যদি জীবিত আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কালের দ্বিগুণ অর্থাৎ যতদিন হইল অনুদ্দেশ হইয়াছে সেই সময়ের দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবে। কোনো

তদেতৎ শ্লোকশতসহস্রমাসীৎ। তেনাধ্যায়সহস্রেণ মনুঃ প্রজাপতিরুপনিবধ্য দেবর্ষয়ে নারদায় প্রাযচ্ছৎ ইত্যাদি—

সংবাদ না পাইলে পূর্ব্বোক্ত কাল নিয়ম অর্থাৎ যে সময় ইচ্ছা বিবাহ হইবে।”

এই শ্লোকের পর আর কিছু বলিবার আছে কিনা, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যদি শ্লোকের উদ্দেশ্য বাগ্দত্তা কন্যাকে লক্ষ্য করিয়াই হইত তাহা হইলে, “সন্তানবতী হইলে”—আব “সন্তানবতী না হইলে” এই ভিন্ন ব্যবস্থা থাকিত না। কেননা বাগ্দত্তা কন্যার যে সন্তান হইতে পারে না—অন্তত হওয়া উচিৎ নয়, ইহা বোধ হয় যুদ্ধেচ্ছু রথীগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

বর্ত্তমান সমাজের কানের নিকট শাস্ত্র ব্যবসায়ী কতিপয় ব্যক্তি এমন ভাবে শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা শুনাইয়া সমাজের গতি-বেগ ব্যাহত করিয়াছেন—হিন্দুর অতীতের জীবন্ত সমাজকে নিরন্তর বিধি নিষেধের সঙ্কীর্ণ আঘাতে এমন নির্ম্মম ভাবে আহত করিয়াছেন যে হিন্দুর সেই মহান, উদার, প্রাণ-বান সমাজ আজ মূর্চ্ছিত, মৃতকল্প ও অসার হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত শাস্ত্রকেও সমাজ আজ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে ভয় পায়। এই যে **Riligious Hypnotism (Lennin,)**-ধর্ম্মের মোহ, ইহাকে অপসারিত করিতে হইবে ; যুবক বাংলার আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—সমাজের প্রতি স্তরে-স্তরে যাইয়া এই ধর্ম্মের মিথ্যা মোহকে খুঁজিয়া বাহির করা। আর সমাজের কানে প্রতিনিয়ত এই বেদবাণী শুনাইতে হইবে,—

“এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল
এই পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল।”

ইহা না করিলে দেশ ও সমাজকে এই অতি-আসন্ন-ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার আর কোনো উপায়ই থাকিবে না।

এইবার আমরা বিধবা বিবাহের সমর্থক আরো কতিপয় ঋষির বচন উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

স্বয়ং বেদ বলিতেছেন,—

ইমা নারীরবিধবা সুপত্নীঃ আঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবো হ্যন মৌবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যে নিমগ্রে॥
ঋগ্বেদ (১০, ১৮, ৭)

(সংগ্রামাদি স্থলে নিহত ব্যক্তিগণের বিধবা পত্নীসকল রোদন করিতে থাকায়, তাহাদিগকে বলা হইতেছে) কেন ইহারা আর্তনাদ করিতেছে? উহারা বিধবা হইয়া থাকিবে না। উহারা চক্ষুতে ঘৃতাক্ত অঞ্জন ও অঙ্গে বেশভূষা ধারণ করিয়া উত্তম উত্তম পতি বরণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করুক।

সমান লোকা ভবতি পূনর্ভূর্বা পরঃ পতিঃ।
অথর্ব্ববেদ (২৮)

বিধবা পুনরায় বিবাহ করিলে সে নব পতিসহ পতি লোক প্রাপ্ত হইবে।

দ্বৌতু যৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভ্যাং যাতৌ স্ত্রিয়াধনে।
তয়োর্যদ্ যস্য পিত্র্যাং স্যাৎ তৎ সংগ্রহীত নেতরং॥
মনু ৯ম অধ্যায় ১৬৬ শ্লোক।

কোনো বিধবা তাহার নাবালক পুত্রের বিষয় কর্ম্ম তত্ত্বাবধান করা অবস্থায় যদি পুনবায় বিবাহ করে এবং নূতন স্বামীও একটি নাবালক পুত্র রাখিয়া যদি প্রাণত্যাগ করে এবং সেই নাবালকেরও সম্পত্তি দেখা-শুনা করিতে থাকা অবস্থায় যদি বিধবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্বামী দ্বারা উৎপাদিত পুত্র সাবালক হইয়া নিজ নিজ পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। (সন্তানবতী বিধবাব পুনর্ব্বিবাহের মস্ত প্রমাণ)

কন্যৈবাক্ষতযোনির্বা পাণিগ্রহণ দূষিতা।
পুনর্ভূঃ প্রথা প্রোক্তা পুনঃ সংস্কাব মর্হতি॥

নাবদস্মৃতি (১২।৭৬)

যে কন্যা পানিগ্রহণের পব বিধবা হইয়াছে সে যদি অক্ষতযোনি থাকে তাহা হইলে তাহাব পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হইবে।

যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎস্‌জ্য অন্যং।
পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি।

বশিষ্ঠ সংহিতা ১৭ অধ্যায়।

যে স্ত্রী ক্লীব, পতিত বা উন্মত্ত পতিকে পরিত্যাগ, অথবা পতির মৃত্যু হইলে, অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণুও এই বাক্যের সারাংশ সমর্থন কবিয়াছেন।

বিবাহেচ্ছা যদি স্ত্রীণাং ভর্ত্তৃনাশাৎ প্রজায়তে।
পুনরক্ষত যোনীনাং বিবাহ করণং মতং ॥

বৃহস্পতি।

অক্ষতযোনি স্ত্রীগণ বিধবা হইয়া পুনবায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদের বিবাহ দেওয়া উচিত।

পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।
সাত্যুদ্ বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈব ধর্ম্মেষ্বয়ং বিধি।

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র।

স্বামীর সহিত রমণ হওয়ার পূর্ব্বে যদি কোনো স্ত্রী বিধবা হয়, তবে পিতা সেই কন্যার পুনরায় বিবাহ দিবে। তন্ত্র মতে এই বিধি।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যঃ শূদ্রাঃ স্বকুল যোষিতাম্।
পুনর্বিবাহং কুর্ব্বীরন্ অন্যথা পাপ সম্ভবঃ ॥

(জাবালী)

ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের লোক, বিধবা হইলে নিজ নিজ কুলাঙ্গনাদের পুনর্বিবাহ দিবে। এরূপ না করিলে পাপাচার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

এই প্রকার সহস্র সহস্র বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যাহাতে একবাক্যে বিধবা বিবাহের সমর্থন করিতেছে। আমরা কাহারো প্রতি অবিচার করিতে চাহি না। কোন্ কোন্ শাস্ত্র বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাও আমরা উল্লেখ করিতেছি।

পরাশর ভাষ্যধৃত আদি পুবাণের একটী শ্লোক, ক্রতুর একটী, বৃহন্নারদীয় একটী ও আদিত্য পুরাণেব একটী—হিন্দুর অসংখ্য ও অগাধ শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া বিরুদ্ধ-পক্ষ মাত্র এই কয়েকটী শ্লোক উপস্থিত করিতে পারিয়াছেন। তাহাও সম্পূর্ণভাবে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচবণ করিতেছে না। নিতান্ত কষ্টকল্পনা করিয়াই উক্ত শ্লোকগুলির বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা কবিতে হয়। তারপর মানিয়া লইলাম, সত্যসত্যই উক্ত বচনগুলি বিধবা বিবাহেব পবিপন্থী। তাহা হইলেও কোনো ক্রমেই উহা শাস্ত্রবাণী বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পাবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শাস্ত্র নির্দ্দেশ কবিতেছে, বেদ ও স্মৃতি বর্ত্তমান থাকিতে পুবাণ প্রভৃতিব কোনো মূল্যই বিবেচিত হইবে না। ইহা বামার বা শ্যামার কথা নহে—স্বয় পুবাণ কর্ত্তা ভগবান ব্যাসের কথা। কাজেই ইহা লইয়া অধিক বিচার করিবার কোনো প্রয়োজনীয়তাই নাই।

হিন্দু শাস্ত্র হইতে দেখান হইয়াছে বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্র সম্মত। যাহারা দেশেব বিপদ, জাতিব দুর্দ্দশা উপেক্ষা কবিয়া একমাত্র নিজেদেব জিদ্ ও মিথ্যা শাস্ত্রাচার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে ইচ্ছা করেন—তাঁহাদেব বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই; কিন্তু হিন্দু সমাজেব কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই অতীতের এই বিরাট স্মৃতি, হিন্দু জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিবেন না। বিধবা বিবাহ তো অতি তুচ্ছ কথা, যেখানে জীবন-মরণের আহ্বান. জাতিব বাঁচিবার জন্য যে কোনো ব্যবস্থা—তা যতই

অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিরুদ্ধ পক্ষ ঘোষণা করুক,—নির্ব্বিচারে তাহা আজ গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহাই হিন্দু-গণ দেবতার আজ শ্রেষ্ঠ আদেশ।

শাস্ত্র সম্মত হইলে রহিত হইল কেন ?

যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ নহে, শাস্ত্রীয় প্রমাণ শুনিয়াও আজন্ম সংস্কারের বশে তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে,—"যদি শাস্ত্র-সম্মতই হইবে, তবে এ প্রথা উঠিয়া গেল কেন ?" প্রকৃত-পক্ষে দেশ বা সমাজ বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্র কি বলিতেছে বা শাস্ত্র কি নিষেধ করিতেছে তাহা বড় খোজ করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক নয় ; কোনো একটা বিশেষ প্রশ্ন মনের কোণে ঠেলিয়া উঠিলে পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী "দাদা ঠাকুরের" মতামতের উপরই তাহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বাংলার হিন্দু সমাজ শাস্ত্র মানে না—শাস্ত্রের কথা বোঝেও না ; এই বিরাট মোহাবিষ্ট জাতি ঐ "দাদা ঠাকুরদের" কথামতই চলিয়া আসিতেছে। তাহারা আরো জানে—বাপ দাদা যাহা করে নাই, তাহা করিলে অধর্ম্ম বই ধর্ম্ম হইতেই পারে না।

এই "কেন" প্রশ্নের জবাব কোনো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরই অজ্ঞাত নহে, কিন্তু তাহারা তাহা জাতিকে শুনাইবেন না। শুনাইলে জাতি যদি দৈবাৎ এই মরণের ঘর হইতে বাঁচিয়াই ওঠে !

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে এই কলিযুগের প্রধান শাস্ত্রকার পরাশর ঋষি। তিনি যে "নষ্টে মৃতে" শ্লোকে বিধবা বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন, তাহার পরই বলিতেছেন,—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গলাভ করে।

তিস্রঃ কোটোাহর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

মনুষ্য শরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে তৎসমকাল স্বর্গে বাস করে।

এই শ্লোক দু'টীতে বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচারিণীর অবস্থাকে শ্রেষ্ঠতর এবং সহমরণকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া ঋষি ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্তরের সকল ব্যক্তিই অন্ধের মতো ইহাকে স্বীকার করিল যেদিন, সেইদিনই দেশের সর্ব্বনাশের সূচনা হইল সর্ব্বপ্রথম।

আমরা রামায়ণের কালে দেখিতেছি বিধবা বিবাহ সমাজ মধ্যে প্রচলিত ছিল। যদি তর্কস্থলে উপস্থিত করা যায় যে একমাত্র তারা ও মন্দোদরীর বিবাহ ছাড়া তো আর কোনো রমণীর বিবাহ দেখা যায় না, তাহার উত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যৎকালে আশ্রম ব্যভিচারে শূদ্রকের প্রাণ-

দণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সমাজ-শৃঙ্খলা যে তৎকালে পূর্ণরূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল—শুধু তাই নয় আদর্শ রাজা রামচন্দ্র উহার পরিপোষক ও পরিচালকরূপে সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন—তাহা রামায়ণের বহু পৃষ্ঠাই উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। সেই আদর্শ চরিত্র রামচন্দ্রের সময়ই তারা ও মন্দোদরীর পুনর্ব্বিবাহ সংসাধিত হয় এবং তিনি তাহার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। এ অবস্থায় সমাজে যে বিধবা বিবাহ প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল না, তাহা কে বলিতে পারে? সুগ্রীব বা বিভীষণকে যে ইহার জন্য কোনো প্রকার সামাজিক প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছে তাহা আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই না; পরন্তু অযোধ্যায় ইহারা পরম সমাদরই অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছে। এবং সেই তারা ও মন্দোদরী হিন্দু মাত্রেরই প্রতিদিন প্রাতে স্মরণীয় ও পূজনীয় বলিয়া হিন্দুর ঋষি ব্যবস্থাও দিয়াছেন। রামায়ণের কোথাও সহমরণ খুঁজিয়া পাই না। ইহার পর মহাভারতের কথা; মহাভারতে দেখিতেছি, বিধবা বিবাহও যেমন সমাজে প্রচলিত, তেমনই সহমরণ কদাচিৎ লক্ষিত হয় এবং ব্রহ্মচর্য্যও অনেকেই পালন করিয়া থাকে। মাদ্রীর সহমরণ, উলুপীর পুনর্ব্বিবাহ এবং কুন্তী, উত্তরা প্রভৃতির ব্রহ্মচর্য্য আমাদের সম্মুখে ঋষিবচনের সার্থকতা ও সামঞ্জস্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে এই সময়ে অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী পত্যন্তর গ্রহণও সমাজ মধ্যে প্রচলিত ছিল; এবং বর্ত্তমান সমাজ-প্রচলিত এক পতির

পরিবর্ত্তে এককালে বহু স্বামী গ্রহণ প্রথাও নিন্দনীয় বলিয়া সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করে নাই।

মহাভারতের সময় হইতেই কলি নাকি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এবং কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে তখন কলির প্রায় ৬০০ শত বৎসর উত্তীর্ণও হইয়া গিয়াছে। তখন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে তবে অধিক সংখ্যক নারী ব্রহ্মচর্য্যের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতেছে ; "শ্রেষ্ঠতম" পথের প্রতি খুব বেশী লক্ষ্য নাই। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তীকালে মুসলমানের অত্যাচারে এই শ্রেষ্ঠতম পথই সমাজের প্রধান কাম্য ও অবলম্বনীয় হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের কথা। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে অত্যাচারিত দেশের বহুসংখ্যক নারী বিধবা না হইয়াও স্বেচ্ছায় অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছে।

সমাজপ্রচলিত বিধবা বিবাহ প্রথা কেমন করিয়া আস্তে আস্তে লোপ পাইয়াছে তাহার পারম্পর্য্য উপরে লক্ষিত হইবে, কিন্তু কারণ কি ?

সাধারণতঃ মানুষের মন, সর্ব্বদাই কি সাংসারিক হিসাবে আর কি আধ্যাত্মিক রাজ্যে, শ্রেষ্ঠতর পথের দিকেই ধাবিত হয়। সংসারে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে ক্রমেই উন্নতির দিকে মানুষ আগাইয়া যাইবার জন্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিয়া থাকে। এবং সশ্রদ্ধ মুগ্ধদৃষ্টিতে অভিপ্সিত লক্ষ্যের প্রতি তাহার যে ব্যাকুল কামনা, ইহাই তাহার যাত্রা পথের একমাত্র সম্বল। অন্যদিকে যাহারা প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর অবস্থার মালিক, নিম্নতর

অবস্থার ব্যক্তির প্রতি তাহাদের উচ্চত্বের কৃপা আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু মানুষের মন ইহাতে পরিতৃপ্ত হয় না। মানুষ কৃপা করিতে পারিলে সুখী হয়—কৃপা লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে তো করেই না বরং জীবন অনেক সময়ই দুর্ব্বহ মনে করিয়া থাকে।

একটা বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টী পরিস্কার করিতে চেষ্টা করিব। অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে যখন দেশের ঘুমন্ত যৌবন অকস্মাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল, সেদিন বাংলার অধিকাংশ স্কুল ও কলেজ হইতে ছেলের দল বাহির হইয়া আসিয়াছিল; বয়কট করা ছেলের সংখ্যা অত্যধিক বেশী হইলেও ইহার প্রতিবাদীও একেবারে কম ছিল না। স্কুল ও কলেজ হইতে বাহির হইয়া এই অসহযোগীর দল যে কিঞ্চিদধিক গর্ব্বোৎফুল্ল হইয়াই চলিত ফিরিত,—অন্তত পুনরায় স্কুলে বা কলেজে ঢুকিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্যদিকে যাহারা যে কোনো কারণেই হউক, সেদিন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে নাই—তাহারা কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াই থাকিত। ঠিক ঐ একই রকম সব ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। উকীলদের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় নাই। "অসহযোগী" ও "সহযোগী" উকীলের মেজাজ সে দিন যাহারা পরিমাপ করিয়াছে, তাহারা সেই সময়ই ইহার বিরুদ্ধে মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ইহা হয় কেন?

দেশে সে দিন যে ভাবের বান ডাকিয়াছিল তাহাতে

প্রত্যেক ভারতবাসীর মনই অসহযোগিতার উপর একটা অখণ্ড শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে পথের যাহারা পথিক হইল, তাহারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া সহযোগীদের উপর একটু আধটু ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িল না। অসহযোগিতায় বিশ্বাসী না হইয়াও, মহাত্মার যুক্তিতে আত্মপ্রত্যয় না পাইয়াও, শুধু নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও অহমিকা বজায় রাখিতে সে দিন অনেকেই কপট অসহযোগী সাজিয়াছিল, ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কাপট্যের প্রতিফলও দেশ চারিগুণ হিসাবেই আজ ভোগ করিতেছে।

ঠিক এই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাণ না চাহিলেও, দেহ স্বীকার না করিলেও, একমাত্র বাহিরের শুচিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে, লোকের কাছে শ্রেষ্ঠ পথের অধিকারী হিসাবে পরিচিত হইবার আশায় ক্রমেই সমাজ শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম পথের পথিক হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এমনি করিয়া সমাজস্থ তথাকথিত উচ্চবর্ণের শিক্ষা, সতর্কতা ও সামাজিক আচার ব্যবহারের সুযোগ ও সহায়তায় যে ব্যবস্থা জাতির কল্যাণকর না হইলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছিল, ঠিক সেই সেই সুযোগ ও সহায়তার অভাবেই হিন্দু সমাজেব বহু সম্প্রদায় দ্রুত ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিতে লাগিল। একথা শ্রুতিকঠোর হইতে পারে, কিন্তু অসত্য নহে।

যে দিন বিধবা বিবাহ নিকৃষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া সমাজের চক্ষে ঘৃণ্য হইয়া উঠিল এবং পরবর্ত্তী কালে যখন "সতীপ্রথা"ও রদ্

হইয়া গেল, শিক্ষা ও সামাজিক আচার নিষ্ঠার আঁওতায় বর্দ্ধিত ব্রাহ্মণাদি সম্প্রদায় ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরালে কিয়ৎপরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও, শিক্ষা ও আচারবিহীন বহু সম্প্রদায় অনুকরণ করিতে যাইয়া আত্মরক্ষা তো দূরের কথা, অনিবার্য্য আত্মহত্যার পথকেই বরণ করিয়া লইল।

সতীপ্রথা সম্বন্ধেও ঠিক ইহাই হইয়াছিল। বিধবা জীবনের জন্য শাস্ত্র তিনটী পথই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—বিধবা বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ। বিধবা বিবাহ প্রথা যে দিন সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল এবং ব্রহ্মচর্য্য পালনও বিদেশী ও বিধর্ম্মী মুসলমানের অত্যাচারে নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইল না—সেদিন বিধবা জীবনের একমাত্র অবশিষ্ট পন্থা রহিল, সহমরণ। মানুষ মনের সহিত খাপ না খাইলেও অন্যের অগোচরে একটা কৃত্রিম জীবন বহন করিতে পারে, কিন্তু কৃত্রিম মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে না। কেননা মৃত্যুর মৃত্যু ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় রূপ নাই। করিতে হইলে ঐ নিছক ও নির্জ্জলা মৃত্যুকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সেদিন তাই, ব্রহ্মচর্য্য জীবন যাপনের পথে যেমন অনেকেই স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসিয়াছিল, মৃত্যুর বেলায় তাহা পারিল না। সেদিন, আমরা জানি, সমাজকে পৈশাচিক বল প্রয়োগ করিয়া এ ব্যবস্থা বিধবাকে স্বীকার করাইতে হইয়াছিল।

কটূক্তির ভয়ে নহে, পাছে আবার প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর অযথা আক্রমণ হয় এই জন্য একটা কথা বলিতে চাই। প্রিয়তমের স্মৃতির জন্য পাগল হইয়া সহমরণে যাইবার কথা

বা প্রেমাস্পদের স্মৃতির চিতা বুকে করিয়া আজীবন অগ্নি পরীক্ষা দেওয়া হিন্দু হিসাবে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না বা করি না। এ চিত্র আজো সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই; কোনো রাজদণ্ড ইহাকে সংযত করিতে পারে না—কোনো বিভীষিকা বা লোকনিন্দা ইহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে সমর্থ হয় না। আজো সহমরণ হিন্দুর সমাজে সম্ভবপর হয়, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যও বিরল নহে।

শাস্ত্রসম্মত হইলেও, একটা কপট ও কৃত্রিম শ্রেষ্ঠত্বের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াই সমাজ এই আত্মঘাতী পথে যাত্রা করিয়াছে—ইহাই আমার শেষ কথা।

দেশাচার।

ইহার পরই প্রশ্ন হইয়া থাকে—শাস্ত্রসম্মত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যে কারণেই হউক, স্মরণাতীত কাল হইতে যখন সমাজে অপ্রচলিত, তখন এই দেশাচারবিরুদ্ধ ব্যবস্থা কেমন করিয়া সমাজ গ্রহণ করে?

দেশাচার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমেই একটা গল্প লইয়া আরম্ভ করিব। আমাদের দেশে.................... দাসের সঙ্গে একটী বিধবা বহুকাল হইতেই বাস করিতেছে। প্রকাশ্য-ভাবেই উহারা স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করে, তবে এ পর্য্যন্ত কোনো সন্তানাদি হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও প্রকাশ

পায় নাই। সমাজ কোনো দিনই উহার প্রতিবাদ করে নাই, এখনো কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। পূজা-পার্ব্বনে তাহাদের জমীদার ব্রাহ্মণ বাড়ীর যথেষ্ট কাজই উহারা করিয়া থাকে,—এমন কি পূজার ঘরের ফুল বেলপাতা প্রভৃতি উপকরণ পুরোহিতকে সাজাইয়া দিয়া এবং আরো নানাপ্রকারেই তাঁহাকে সাহায্য করিয়া উক্ত বিধবাটী পুরোহিত এবং গৃহস্থকে কৃতার্থ করে। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় ঐ বিধবার হাতের জল খাইয়া অনেক রথী মহারথী নিজের জীবন এবং স্বর্গস্থ পিতৃ-পুরুষের মহাপ্রাণকে ধন্য করেন।

সম্প্রতি দেশে যাইয়া একদিন এই সব কথা আলোচনা করিতেছিলাম। আমাদের মতাবলম্বী আমরা অনেকেই সেখানে ছিলাম, আর ছিলেন গ্রামের সর্ব্বসাধারণ্যে 'সাধু' নামে পরিচিত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ···············দাদা মহাশয়! কথায় কথায় উক্ত··················দাসের কথা উঠিল এবং দাদামহাশয়ের জনৈক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া উঠিলেন, "···কি বল···············কাকা, যদি··········· দাস ওকে শাস্ত্রমতে বিয়ে করে নিত, তবেতো আর তোমরা ওকে সমাজেও ঠাঁই দিতে না—আর ওর হাতের জলও তোমাদের কাছে এখনকার মতো পবিত্র থাক্‌তো না! বিয়ে না করেই ও আছে ভালো— কি বল?······"

দাদামহাশয় একটু ঢোক গিলিয়া—কেননা কনফারেন্সে আমাদের দল তখন সংখ্যায় ভারী······আস্তে বলিলেন— "বুঝ্‌লে কিনা··· ···ওটা যে হচ্ছে·· দেশাচার; বুঝতে···

আমাদের মিলিত হাসির হট্টগোলে তাঁহার তোত্‌লানী কথা ডুবিয়া গেল।

ইহাই হইতেছে দেশাচারের বাস্তব রূপ, এবং ঐ দাদামহাশয়ের দল চিরকাল সমাজের সব প্রকার পাপ ও গ্লানি এমনি করিয়াই দেশাচারের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে অভ্যস্ত। ইঁহাদের নিকট সব যুক্তি ও প্রমাণই মূল্যহীন। পঞ্জিকা এবং নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া ইঁহারা ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখেন এবং নিজেদের মনোবৃত্তি ও মানসিক অবস্থার সহিতই ইঁহারা জগৎকে বিচার করিয়া থাকেন।

এই দেশাচার সম্বন্ধেও শাস্ত্র স্পষ্ট ব্যবস্থা দিতে দ্বিধা করেন নাই। শাস্ত্রকার ঋষি জানিতেন এককালে লোকে শাস্ত্রের নামে দেশাচারেরই পূজারী হইয়া পড়িবে এবং সমাজ হইতে চিরতরে শাস্ত্রের নির্ব্বাসন দিবার চেষ্টা করিবে। তাই সত্যসন্ধ ঋষি বলিতেছেন,—

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ॥
মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব।

যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে, বেদ সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ, লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ।

মহাভারতকে আমরা চতুর্থ বেদ বলিয়া স্বীকার করি, হিন্দু মাত্রই মহাভারতকে অন্যতম প্রধান প্রামান্য শাস্ত্র

বলিয়া বিশ্বাস করে। মহাভারত দেশাচারকে কোনো আমলই দেন নাই। ইহার পর স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন,—

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ॥

যে স্থলে বেদে অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা স্পষ্ট নিষেধ না থাকে, সেই স্থলে দেশাচার ও কুলাচার অনুসারে ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়। দেশাচার ও কুলাচার যে কেমন করিয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। একটা গল্প বলিব।

জনৈক গৃহস্থের বাড়ীতে অনেকগুলি বিড়াল ছিল, কোনো ক্রিয়া কর্ম্মে পাছে বিড়ালগুলি পুণ্যকর্ম্মের উপকরণ পূর্ব্বাহ্ণেই অপবিত্র করিয়া ফেলে এই ভয়ে গৃহস্থ বিড়াল গুলি ক্রিয়া কর্ম্মের দিন খাঁচায় পুড়িয়া রাখিত। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা কারণ বুঝিল না—শুধু দেখিল যে তাহাদের বাড়ীর যে কোনো ক্রিয়া কর্ম্মের দিন বিড়াল খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। ইহার পর গৃহস্থের অভাবে ছেলে মেয়েরাই যখন বাড়ীর কর্ত্তা হইল তখন যত্নের অভাবে বিড়াল গুলিও বাড়ী হইতে বিদায় লইল। কিন্তু ক্রিয়া কর্ম্মের সময় তাহাদের যে বিড়াল চাই-ই। ওটা যে কুলাচার! কাজেই পুরোহিতকে নিজের বিড়াল যজমানকে ধার দিতে হইত এবং ক্রিয়ার সময় খাঁচায়-বন্ধ-বিড়াল সম্মুখে রাখিয়া দেবতার অর্চ্চনা সম্পন্ন করিতে হইত। এমনি করিয়া গৃহস্থের পুত্র কন্যারা যে যেখানে ছিল,—

বিড়াল খাঁচায় পোড়া তাহাদের নিকট পূজা পার্ব্বনের অঙ্গ বিশেষ বলিয়াই মনে হইত এবং এ বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাহারা কোনো দিনই শৈথিল্য প্রকাশ করে নাই। ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। পূজ্যবাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরজীবন এই দেশাচারের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিলেন। বড় দুঃখেই তিনি বলিয়াছেন,—

"ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পন করিয়াছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্ম ভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্ ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে, সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত, যথেচ্ছচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিক রক্ষা গুণে * সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃতি সাধুপুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিক রক্ষার অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর

* লৌকিক—লৌকিক আচার অর্থাৎ লোকাচার বা দেশাচার।

শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন, তোর অধিকারে যাহারা, জাতিভ্রংশকর ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত রত হইয়া কালাতিপাত করে কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না ; কিন্তু যদি কেহ, সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও এক কালে সকল ধর্ম্মের লোপ হইয়া যায়।”

ঊনবিংশ শতাব্দির এই মহাপ্রাণ ঋষি চোখের জলে যে সত্যের রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন,—জাতির এই নব জাগরণের দিনে সে মহাবাণী কি জাতির দুয়ারে উপেক্ষিত হইয়াই ফিরিয়া যাইবে ?

সমাজ শৃঙ্খলার বিরোধী

যথাঃ—স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা রহিত হইবে ইত্যাদি।

শাস্ত্র ও দেশাচার প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের কথা ছাড়াও আরো কতকগুলি ছোটখাটো প্রশ্ন হইয়া থাকে এবং বিরুদ্ধ পক্ষ এগুলিকেও খুব মূল্যবান কারণ মনে করিয়াই তর্ক করিয়া থাকেন। একটা কথা উঠিয়া থাকে, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই

যদি জানিতে পারে যে জীবিতকাল মাত্রই তাহাদের সম্বন্ধ, তাহা হইলে প্রেম বা ভালবাসার গভীরতা কমিয়া যাইবে। পরকালের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই হিন্দুর দম্পতি এতো নিবিড় ভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বিরুদ্ধ পক্ষ এই প্রসঙ্গে পরকালের মহিমায় মুখরিত হইয়া ওঠে এবং হিন্দু মাত্রেই যে ইহকালের সম্বন্ধটা একটা অলীক, অনিত্য এবং সংকীর্ণ বলিয়া মনে করে তাহার প্রমাণ স্বরূপ সতী, সাবিত্রী, সীতার কীর্ত্তি কাহিনী বলিতে যাইয়া অনেকখানি চোখের জলও ফেলিয়া থাকেন। অনেকে আবার সীতা-সাবিত্রীর সহিত কুন্তী-অহল্যার নাম করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন হিন্দু স্ত্রীলোকের যদি পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়, তবে স্বামী বেচারীরা নাকি সংসারে আর সুখ স্বোয়াস্তীর মুখ দেখিবার অবসর পাইবে না। কেননা নূতন নূতন স্বামী পাইবার লোভে বর্ত্তমান স্বামীর প্রতি তাহাদের আকর্ষণ কমিয়া যাইবে। দুই একজন এমন মহারথীও আছেন যাঁহারা আর একটু অগ্রসর হইতেও দ্বিধা বোধ করেন না। ইঁহাদের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক নারী বর্ত্তমান স্বামী অপছন্দ হইলে অথবা স্বামীর সহিত মনান্তর ঘটিলে নূতন স্বামী পাইবার পথ খোলসা করিতে যাইয়া বর্ত্তমানকে হত্যা করিতে মোটেই দ্বিধা বোধ করিবে না। কাজেই বিধবা বিবাহে নরহত্যার প্রসারতা—সমাজে

মহা বিশৃঙ্খলতা,—এই তো সাক্ষাৎ নরক। বাস্! এক নিঃশ্বাসে সমাজের ভবিষ্যৎকে সমাধিস্থ করিয়া ইহারা বক্তব্য শেষ করেন!

এই সমস্ত কথার উত্তর দিবার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। যাহার মস্তিষ্কে গোময়ের পরিবর্ত্তে সামান্য কিছুও স্নেহ পদার্থ বর্ত্তমান আছে, সেই একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে, এই সব আপত্তি বা মতবাদ কত অসার ও অকিঞ্চিৎকর।

থান কাপড় পরা ও আর দুই একটা আচার রক্ষা করাকেই যাহারা পরলোকে স্বামী প্রাপ্তির প্রসস্ত উপায় বলিয়া মনে করে—তাহাদের আমরা কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আজ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই সমাজের এই পরলোক-সমস্যা নিরাকরণের জন্য সবিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। ইহকালেই যাহাদের স্বামী সাক্ষাৎ ঘটিল না—স্বামী মানুষ কি মাটীর পুতুল, এ সম্বন্ধে যাহাদের বিস্তর মতবিরোধ দেখা যায়—তাহাদের পরলোকের প্রলোভনে ভুলাইয়া রাখিয়া ধর্ম্মের ষাড়ের মতো সমাজবক্ষে নর্ত্তন-কুর্দ্দন করা একমাত্র আমাদের দেশেই সম্ভবপর হয়। যে দেশে এক হইতে দশ বৎসরের বিধবার সংখ্যা বেশ মোটা রকমের একটা অঙ্কে দিন দিন পরিণত হইতেছে—১০ হইতে বিশ বছরের বিধবা যে সমাজে সংখ্যাতীত বলিয়া মনে হয়, সে দেশে পরলোকের তত্ত্ব প্রচার করিলে কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের বিশেষ আয়ের সম্ভাবনা আছে অস্বীকার করা

যায় না—কিন্তু ঐ সামান্য আয়ের তুলনায় জাতির ক্ষতির পরিমাণ যে অনেক। আরো মজা এই,—যাহারা যত বেশী বহু স্ত্রীর কামনা করে,—জীবিতা স্ত্রী সত্বেও যাহারা পরস্ত্রীর অভিলাষী, মৃত্যুর পরপারে দাঁড়াইয়াও যাহাদের আবার ষোড়ষী ভার্য্যার মুখ দেখিবার সখ্ প্রাণে জাগে—তাহারাই এই পরলোক-তত্ত্ব ও স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার কথা প্রচার করে বেশী করিয়া। কঠোর হইলেও ইহা প্রত্যক্ষ সত্য যে সমাজে একদল লোক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহাদের বেশাতি ঐ বালবিধবাদের দুর্ব্বহ জীবনের মূলধন লইয়া। এই হতভাগিনীদের জীবন ও যৌবনের বিনিময়ে ইহারা উদর পূর্ণ করিয়া থাকে—এবং পর্য্যাপ্ত ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া নিজেদের জন্ম কৃতার্থ মনে করে। পরলোকের তত্ত্ব প্রচার না করিলে যদি দৈবাৎ ইহাদের মতিগতি বিবাহের প্রতি ঝুঁকিয়াই পড়ে—তবে ঐ তত্ত্বপ্রচারিণী সমিতির কার্য্যই বা থাকিবে কি আর দিন চলিবেই বা কিসে?

যাহারা স্বামী হত্যার ইঙ্গিত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই, তাহাদের গর্ভধারিণী আজ নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতেছেন। নারী জাতির প্রতি যাহাদের এমন কদর্য্য মনোভাব—নারী জাতির চরিত্র এমন নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করিতে যাহারা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না—তাহাদের জন্য সত্য সত্যই আমরা বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলি না। ব্যভিচারই তাহাদের জীবনে খাপ খাইবে ভাল। নারী নরকস্য দ্বারং (!!), নরকের দ্বারে

কৃমি-কীটেরই জন্ম হইয়া থাকে—পারিজাতের আশা করা বৃথা।

তবুও তুই একটী কথা বলিব। সমাজের অধিকাংশ পুরুষ বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীর অভাব হইবা মাত্র বিবাহের চিন্তা করিয়া থাকে এবং সে চিন্তা কার্য্যে পরিণত হইতে বেশী সময় নষ্ট করিতেও হয় না। অথচ প্রথমা স্ত্রীর জীবিত-কালে তাহাকে সত্য সত্যই সে ভালবাসিত বলিয়া তাহার নিজেরও বিশ্বাস। ইহা সত্বেও সমাজের পুরুষ পুনর্বিবাহ করিতে লজ্জা বোধ করে না—বা সমাজও তাহাকে দোষী আখ্যা দেয় না। স্মরণাতীত কাল হইতে এ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক নারীই জানে, তাহার দেহ যতক্ষণ পুরুষের প্রেম ততক্ষণ। দেহ থাকিলেও যদি সে দেহ পুরুষের অভাব পূর্ণ করিতে সমর্থ না হয়—পুরুষের অগাধ, অপরিমেয় প্রেমও ফুরাইয়া আসে এবং জীবিতকালেই দেখিতে পায় সুগঠিত-দেহ-সম্বলিত অন্য নারী তাহার প্রিয়-তমের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত। এই সব দেখিয়াও—পুরুষের এই কপট প্রেম বহুভাবে পরীক্ষিত হইবার পরও—আজও তো নারী তাহার অনবদ্য ভালবাসা ও নিজেকে হারাইয়া ফেলা সেবার কামনা লইয়া পুরুষকে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতেছে। প্রতিদান জানিয়াও কৈ নারী তো কোনো দিনই প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই! এই নারী—এই আত্মহারা মূর্ত্তিমতী সন্ন্যাসিনী, ত্যাগ ও সেবার মূর্ত্ত দেবতা—এই নারী, সে কি না নূতন স্বামীর আশায় বর্ত্তমান স্বামীকে হত্যা করিবে!

ঐ দুগ্ধপোষ্য অজ্ঞান নাবালিকা, সংসারের কুটিল ও মলিন স্পর্শ যাহাকে আজো কলুষিত করিতে পারে নাই, যদি তাহাকে বিবাহ দিলে সত্য সত্যই সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, যদি সত্য সত্যই স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা এই বিবাহের ফলেই সংসার হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়—তবে তাই হোক,—উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধ্বংসই আজ হিন্দুসমাজ বক্ষে নামিয়া আসুক—এই জরাজীর্ণ প্রাণহীন সমাজকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নবসৃষ্টির বেদী রচনা করুক।

নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণ সমস্যা

বরপণ ও কুমারীর বিবাহে বিপত্তি।

যাঁহারা বিগত দুইশত বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিতেছেন তাঁহারাই দেশের অবস্থার কথা ভাবিয়া ক্রমেই আকুল হইয়া উঠিতেছেন। সনাতনপন্থী ও একান্ত সংস্কারান্ধ বলিয়া যাঁহারা এতোকাল পরিচিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে আজ মুখে স্বীকার না করিতে পারিলেও, বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা অন্তর্দেবতার কাছে অস্বীকার করিতে পারেন না। ইঁহাদেরই একদল আজ বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত করিতে চেষ্টা না করিয়া নিম্নবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

রাখা উচিত। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত হইলে ভারতীয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি একটা জঘন্য অবিচার করা হইবে এবং এতোবড় একটা আদর্শ সমাজ হইতে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। ইঁহাদের যুক্তির সহিত অগ্রগামী-পন্থীদের সামঞ্জস্য না থাকিলেও একটা কথা অতীব সত্য যে একান্ত দেশও সমাজের প্রতি মমতা ও কল্যাণ বুদ্ধির প্রেরণা লইয়াই ইঁহারা এতোদূর নামিয়া আসিয়াছেন। অগ্রগামী-পন্থীরা স্বীকার না করিলেও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে স্মরণাতীত কাল হইতে যে শিক্ষা ও বেষ্টনীর মধ্যে ইঁহারা মানুষ হইয়াছেন, বর্ত্তমানের ও অতীতের মনোবৃত্তি তুলনা করিলে যে পার্থক্য ও অসমতা পরিলক্ষিত হয়, তাহার সত্য-কারের মূল্য বড় কম নহে। ইঁহাদের যুক্তির প্রতি উপেক্ষা না দেখাইয়া শ্রদ্ধা ও প্রেমের সাহচর্য্যে ইঁহাদেরও সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে।

উপরের প্রস্তাবটীর যাঁহারা মালিক তাঁহাদের যুক্তি নিম্ন রূপঃ—

ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ আজো অক্ষুণ্ণ আছে; শুধু তাই নয় এই ব্রহ্মচর্য্য-জীবন হিন্দুজাতির একটা পরম গৌরবময় আদর্শ। ইহাকে জোর করিয়া ধ্বংস করিলে জাতির অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ হইতে পারে না। অপর দিকে নিম্নবর্ণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ বর্ত্তমান না থাকায় ব্যভিচার প্রভৃতি বাড়িয়া চলিয়াছে; কাজেই উহাদের জন্য একটা কিছু করা উচিত। তবে বিবাহ কথা বাদ দিয়া

অন্যান্য জাতির যেমন নিকা প্রভৃতি হইয়া থাকে, ইহাদের জন্যও সেই ব্যবস্থাই করা উচিত। বিবাহ কথাটা নাকি তাঁহাদের সংস্কারে অত্যন্ত বেখাপ্পা বলিয়া বোধ হয় ইত্যাদি।

ইহার উত্তর হইবে এইরূপ:—ব্রাহ্মণই হোক আর শূদ্রই হোক,—যাহারা সত্য সত্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য জীবনই অবশ্য অবলম্বণীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবে তাহাদের জোর করিয়া কোনো ব্যক্তিই বিবাহ দিতে পারে না—অথবা এমন ইচ্ছাও কেহ পোষণ করে না। বিধবা বিবাহ তো দূরের কথা, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি যে সমস্ত সমাজে অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, সে সমস্ত সমাজেও ব্রহ্মচারী জীবন সুদুর্ল্লভ নয়। অবশ্য ভারতীয় হিন্দু সমাজের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু অভারতীয় সমাজেও ইহা বিরল নহে। বস্তুত ইহা একটী মানসিক অবস্থা—এ অবস্থাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কি নারী, কি পুরুষ, এই উচ্চতর পথের যাহারা পথিক, দেশ ও কালের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মানবতার দরবারে তাহারা পূজা পাইবেই। ভারতবর্ষেও যৎকালে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল—সেই একই সময়ে, আমরা দেখাইয়াছি ব্রহ্মচারিণীর সংখ্যাও কম ছিল না। সমাজ তখন উদার ও সার্ব্বজনীন ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল বলিয়াই ইহাদের যাহার যাহার প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিতে কোনো দিন সে কার্পণ্য করে নাই।

আজ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলেই ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ নষ্ট হইয়া যাইবে ইহা সত্য কথা নহে ; বরং তাহা অধিকতর সমুজ্জ্বল হইবে। মানসিক অবস্থা ও দেহ-ধর্ম্মের প্রতি কোনো প্রকার লক্ষ্য না দিয়া, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বিচার না করিয়া, যে কোনো নারীকে আজ জোর করিয়া একটা কপট ও দুর্ব্বহ জীবন বহন করিতে বাধ্য করা হইতেছে এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরূপ প্রকৃত যে ব্রহ্মচারিণী তাঁহার প্রতিও আমরা সুবিচার করিতে পারিতেছি না। কিন্তু যে দিন সমাজ এই অত্যাচারের শাসন দণ্ড সংযত করিয়া একমাত্র মানবতা ও প্রেমের মঙ্গল স্পর্শ সম্বল লইয়া যাত্রা-পথের গতি নির্দ্দেশ করিবে—সে দিনের যে পরীক্ষিত ব্রহ্মচারিণী—তিনিই হইবেন প্রকৃতপক্ষে ভারতের বৈশিষ্ট্যের পূজারিণী, তাঁহার জীবনই হইবে ভবিষ্যৎ বংশধরের ধ্যানের আদর্শ। আর এই জঘন্য কাপট্য ও দুর্নিবার দৌর্ব্বল্য পরিহার করিয়া যে মহীয়সী নারী একমাত্র সত্যকেই মনে, প্রাণে ও দেহেও স্বীকার করিয়া জাতির জয়যাত্রার সাথী হইবেন,—তাঁহাকেও জাতির প্রবুদ্ধ বিবেক পূজার অর্ঘ্য দিতে কার্পণ্য করিবে না।

ইহা অস্বীকার করিবার উপাই নাই যে ব্রাহ্মণাদি কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য সকল ক্ষেত্রে প্রতিপালিত না হইলেও ব্যাভিচার প্রভৃতি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। অন্যদিকে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা ব্যাপক ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু

ইহার জন্য দায়ী কে? সমাজ নহে কি? ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের দায়িত্বও এ-ক্ষেত্রে বড় কম নয়। ব্রহ্মচর্য্যের বড় বড় কথা কপচাইলে সমাজ তাহা গ্রহণ করে না, তাহার জন্য চেষ্টা ও প্রাণের প্রয়োজন। প্রাণহীন সমাজপতি নিজেদের মিথ্যাচার ও ব্যাভিচারের প্রবৃত্তি লইয়া, পশুর লালসা সম্বল করিয়া ব্রহ্মচর্য্যেব আদর্শ বিকাইলে তাহাতে সুফল ফলে না। যে সমাজের শতকরা ৫০এর অধিক পুরুষ ব্যাভিচারের কলঙ্ক-পঙ্কে নিমজ্জিত সে সমাজে নারীর ব্রহ্মচর্য্য-বিধান একটা উপভোগের উপকথা মাত্র। তথাকথিত নিম্ন বর্ণের বিধবাদের মধ্যে যে ব্যাভিচার, তাহার জন্য কে দায়ী? ঐ উচ্চবর্ণের জমীদারকে জিজ্ঞাসা কব—ঐ আভিজাত্য গর্ব্বে গর্ব্বিত ও শিক্ষিতাভিমানী ধনীব তুলালের দিকে তাকাইয়া দেখ। কে উহাদের পথের বাহির করিয়া উপভোগের পর নির্ম্মম ঘাতকের বৃত্তি লইয়া হত্যা করে? কে উহাদের নারীত্ব, সতীত্ব অপহরণ করিয়া পিশাচিনীতে রূপান্তরিত করে? —সমাজ, আজ বুকে হাত রাখিয়া ভগবানের নামে বল দেখি,—যে নির্লজ্জ অবিচারে ও অসহ্য অত্যাচারে তুমি নারীর বুকে চিতার আগুণ জ্বালিয়া দিয়াছ—অবিশ্বাস, অবহেলা, উপেক্ষা ও মর্ম্মান্তিক স্তূপীকৃত আঘাতে তাহার সহজ সরল ও সলীল জীবনকে দুঃখের সাহারায় পরিণত করিয়াছ—তাহার প্রায়শ্চিত্তের পরিমাণ কতখানি? ইহার প্রতিফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে। যুগ-পুরুষের যুগ-শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। যুগ যুগ সঞ্চিত এই

পুঞ্জীভূত লাঞ্ছনার সুদ শুদ্ধ তোমাকে ফিরাইয়া লইতে হইবে।

বিধবা বিবাহের মতো সমস্যা ভাব-প্রবণতার দিক দিয়া বিচার করিলে চলিবে না। যদি ইহাকে গ্রহণ করিতে হয়—প্রয়োজনীয়তা হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। এবং সে প্রয়োজনীয়তা ব্রাহ্মণ শূদ্রের গণ্ডী মানিবে না। তার পর হিন্দু-সমাজের প্রত্যেকেই সমান অংশীদার—সমাজক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেরও যতখানি দাবী ও আবশ্যকতা, শূদ্রেরও ততখানি। এ হিসাবে সামাজিক বিধান সম্প্রদায়গত হইতেই পারে না। সমাজের শাসন ও প্রেম সকলকে সমান ভাবেই বাঁটিয়া দিতে হইবে।

নিম্নবর্ণের নিকা প্রশ্নের কোনো উত্তর আবশ্যক করে না বলিয়া মনে করি। যেখানে স্পষ্ট বিবাহের জন্য শাস্ত্র আদেশ করিতেছেন ও বিধান দিতেছেন, সেখানে এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। প্রত্যেক বিধবা বিবাহই শাস্ত্রমতে সম্পন্ন হইবে।

তারপরের কথা :— যেখানে কুমারী বিবাহ দেওয়াই গুরুতর সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে—সেখানে বিধবা বিবাহের প্রশ্ন তুলিলে সে সমস্যা আরো জটীল হইয়া উঠিবে, অনেকেই এই মত পোষণ করেন।

যাঁহারা লোক সংখ্যার অনুপাত জ্ঞাত নহেন তাঁহারাই এ সমস্ত কথা অধিক বলিয়া থাকেন। অনেকেরই বিশ্বাস ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি কয়েকটী সম্প্রদায়ের, যাহাদের

মধ্যে বর-পণ প্রথা অত্যধিক বাড়িয়া চলিয়াছে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশী। পুরুষ যদি সংখ্যায় কমই না হইবে তাহা হইলে বাজারে উহার এতো দর হইবে কেন?—আর ঝুরি-ঝুরি মেয়ে এই কয়েকটী সম্প্রদায়ে জন্মাইতেছে বলিয়াই মেয়েকে সকলে গলগ্রহ মনে করে এবং মেয়ে জন্মগ্রহণ করিলে সকলের মুখ বিষাদে মলিন হইয়া ওঠে! "একা রামে রক্ষা নাই, তায় সুগ্রীব দোসর!" একেই কুমারীর এই দশা তার উপর আবার বিধবাও যদি বিবাহের জন্য জিদ্ ধরিয়া বসে তবেই সর্ব্বনাশ!

প্রকৃত পক্ষে ঘটনা এরূপ নহে। বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় সমাজের কাপ, কুলীন, ও বংশজ প্রভৃতি ঘরেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বর-পণের আধিক্য লক্ষিত হয়; অপর, এই দুই সমাজেরই বহু শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ আছে, যাহাদের জীবনে বিবাহ করাই একটা সুকঠিন সমস্যা। ইহাদের মধ্যে আবার অনেক ক্ষেত্রেই বর-পণ তো নাই-ই বরং কন্যাকেই কিঞ্চিৎ দক্ষিণার বিনিময়ে লাভ করিতে হয়। ইহা ছাড়াও বাংলায় বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ আছে, তাহা অনেকে বোধ হয় ভুলিয়াই গিয়াছে। এই অজ্ঞাত বিরাট সমাজের সংখ্যা বড় কম নহে। মানুষ এবং সম্প্রদায়গত অধিকার হইতে ইহাদের বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে—দুই চারিজন তথা কথিত উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ইহাদের জন্য ভাবে তো নাই-ই, ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেও তারা কুণ্ঠিত হইয়া থাকে—ব্রাহ্মণেতর জাতির যাহারা যজন যাজন করে সেই

তথাকথিত নিম্নবর্ণের পুরোহিতদের কথাই বলা হইতেছে। ইহারাও যে ব্রাহ্মণ তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ঐ কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া নমঃশূদ্র সাহা, কৈবর্ত্ত, মুচী, মেথর ইহাদের প্রত্যেকেরই ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। ইহারাও আমাদের মতো মানুষ এবং বিবাহ করিবার প্রয়োজনীয়তা ইহাদের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান। কিন্তু এই যে অস্পৃশ্য ব্রাহ্মণ, এদের স্ব স্ব শ্রেণীর লোক সংখ্যা এতো অল্প যে অধিকাংশই আজ বাংলা হইতে নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, এবং তাহার প্রধান কারণ,—কন্যার অভাব। অনেকে বিবাহ করিতে পারে না—অনেকে বৃদ্ধ হইয়া বিবাহ করে—আবার অনেকে এক স্ত্রী মরিয়া গেলে চিরকাল বিপত্নীক অবস্থায় কাটাইতেই বাধ্য হয়। সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘরে খুব কমই পাইয়া থাকে! প্রকৃত পক্ষে যজমান ও পুরোহিত একই জাতিতে পরিণত এবং একই অবস্থায় আজ উপনীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কয়েকটী সম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারীর সংখ্যা মিলাইলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

	পুরুষ	নারী
ব্রাহ্মণ	৭০৯৮১০	৫৯৯৭২৯
কায়স্থ	৬৭৮৯০৭	৬১৮৮২৯

কন্যার সংখ্যা বেশী বলিয়াই যে বর-পণ দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিতেছে একথা সত্য নহে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে হারে কন্যা জন্মগ্রহণ করিত বর্ত্তমানে তাহার তুলনায় নিশ্চয়ই

১০০।২০০ গুণ বেশী কন্যা জন্মগ্রহণ করিতেছে না। কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে ঘরে বরপণ ছিল ১৬৲ কিংবা বড় জোড় ২৫৲ টাকা সেই ঘরে আজ পণের টাকা ঐ বোলর পিছনে ১০০ শত সংখ্যা গুণ করিলে যাহা হয় তাহাতে দাঁড়াইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে কন্যার সংখ্যা নহে, অন্য কোনো বিশেষ ভাবিবার কথা আছে যাহার জন্য এই সর্ব্বনাশের পথ বন্ধ হইতেছে না।

আরো একটা উদাহরণ দিব। বৈষ্ণব, ভূমিজ ও বাউরী, বাংলার হিন্দু-সমাজে কেবলমাত্র এই তিনটী সম্প্রদায়ে কন্যার সংখ্যা কিঞ্চিৎ বেশী। ইহার মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যাই বেশ মোটা রকমের বেশী। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রতি হাজার পুরুষে ১১৬১ জন স্ত্রীলোক দেখা যায়। আর ভূমিজ ও বাউরীর যথাক্রমে ১০০৬ ও ১০০১। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়েই বর-পণের পরিবর্ত্তে কন্যা-পণ প্রচলিত; বলা বাহুল্য পণের টাকার সংখ্যাও খুব কম। এই সমস্ত হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়,—বাংলা দেশের তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যে মারাত্মক বর-পণ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে—বক্তৃতা বা লেখনীর মুখে উহা অপসারিত হইবে না—একটা আমূল সংস্কার করিয়া ইহার গতিবেগ রুদ্ধ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ন্যায় কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যেও এমন অনেক বংশ ও ঘর আছে যাহাদের কন্যা-পণ বহন করিতে হয়। তাহাদের কথাও উপেক্ষণীয় নয়।

একদিকে বাল্য-বিবাহ প্রথা রহিত করিয়া বিধবার সংখ্যা কমাইয়া আনিতে হইবে—অন্যদিকে যাহাতে অন্তত বর্ত্তমানে নিতান্ত নাবালিকা বিধবার অতি সত্বর বিবাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর এই বিবাহে সত্য সত্যই যে বাংলার বহু সম্প্রদায় নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

দত্তা কন্যার পুনরায় দান

সাধারণ ভাবে সকলের মনেই একটা প্রশ্ন জাগে যে, যে কন্যাকে একবার এক পাত্রে দান করা হইয়াছে সেই দত্তা কন্যার পুনরায় দান কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? আর ইহা শাস্ত্র সম্মতই বা হইবে কেমন করিয়া? ইহা একটা ধাঁধাঁ ছাড়া আর কিছুই নহে। দান বলিতে আমরা বুঝি স্বামীত্ব পরিত্যাগ করা—আর দান গ্রহণ করা বলিতে বুঝি—দাতার নিকট হইতে স্বামীত্ব গ্রহণ করা। টাকা পয়সা, জমী বা সম্পত্তি দান ও গ্রহণের সহিত, কন্যার দান-গ্রহণের তুলনা হইতে পারে না। টাকা বা সম্পত্তি স্বামীত্ব না থাকিলে দান করা যায় না—অথচ কন্যা দান যে কেহ করিতে পারে। অভিভাবক শ্রেণীর, মাতামহ হইতে আরম্ভ

করিয়া এমন কি দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি পর্য্যন্তও এ-দানে অধিকারী। এ-দানের সহিত স্বামীত্বের কোনো প্রকার সম্বন্ধই নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানু মতঃ পিতুঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধব স্তথা।
মাতা ত্বভাবে সৰ্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বৰ্ত্ততে।
তস্যাম প্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ সজাতয়ঃ॥
—উদ্বাহত-ধৃত নারদ বচন

পিতা স্বয়ং কন্যা দান করিবেন; অথবা ভ্রাতা পিতার অনুমতি ক্রমে দান করিবেন। এবং মাতামহ, মাতুল, জ্ঞাতি, বান্ধব, কন্যা দান করিবেন; সকলের অভাবে মাতা কন্যা দান করিবেন, যদি তিনি প্রকৃতিস্থা হন; তিনি অপ্রকৃতিস্থা হইলে সজাতীয়েরা কন্যা দান করিবেন।

এই শাস্ত্রবাক্যেই সমস্ত যথাযথ পরিস্ফুট করিয়া লেখা হইয়াছে। যদি স্বামীত্ব হিসাবেই কন্যা দান করিতে হইত, তাহা হইলে পিতার পরই মাতার নাম শাস্ত্র উল্লেখ করিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া মাতার চাইতেও জ্ঞাতি, এমন কি বন্ধু-বান্ধব পর্য্যন্ত কন্যা দানের বেশী অধিকারী বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং পরিশেষে সজাতীয় হইলেই কন্যা দান চলিবে ইহার ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কন্যা দান যে কেহই করিতে পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে, ভূমি, গৃহ বা অন্যান্য সম্পত্তি দানের সহিত কন্যা দানের কোনো তুলনা হইতে পারে না; ইহার সহিত

স্বামীত্বের যখন কোনো সম্বন্ধ নাই, তখন ইহাকে একটা প্রথা মাত্র হিসাবে ধরিয়া লওয়া যায়,—দত্তাপহারী হইবারও কোনো আশঙ্কা থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় কথা, একমাত্র পতিকেই কন্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে;—ইহার সহিত স্বামীত্ব থাকিলে, পতি ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে বিক্রয় অথবা অন্য পাত্রে দানও তো করিতে পারিত। কিন্তু শাস্ত্র-মতে এবং আইনমতে ইহা অসিদ্ধ। ভূ-সম্পত্তির মতোই কন্যাদানও যদি কার্য্যকরী হইত—পতির অভাবে অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় স্ত্রীও উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি বলিয়াই পরিগণিত হইত এবং উক্ত উত্তরাধিকারী ইচ্ছা মতো ভূ-সম্পত্তির মতোই দান-বিক্রয় করিতে পারিত;—ইহাও শাস্ত্র এবং আইন মতে অসিদ্ধ।

তারপর শাস্ত্রে আরো দেখা যায় যে দত্তা কন্যাকে স্বামী জীবিত থাকিতেও অন্য পাত্রে বিশেষ বিশেষ কারণে পুনর্বিবাহ দিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। যথা :—

স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব চ।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপিবা।
উঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণ ভূষণা॥

—পরাশর ভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধু ধৃত কাত্যায়ণ বচন।

যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অন্য জাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছচারী, সগোত্র, দাস, অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে বিবাহিতা কন্যাকেও, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া, অন্য পাত্রে দান করিবে।

এই যে পুনর্দান, ইহার মন্ত্রও শাস্ত্রানুযায়ী প্রথমবারের ন্যায় একই। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কন্যা দান স্বত্বমূলক দান নহে—বিবাহের অঙ্গবিশেষ একটা প্রথা মাত্র। কাজেই যে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত বিধবা বিবাহ দিলে দত্তাপহারী হইবার ভয় দেখাইয়া থাকেন—উঁহাদের কথা নিতান্তই অমূলক এবং অশাস্ত্রীয়। একমাত্র বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্যই, এই সমস্ত অসার আপত্তি উত্থাপন করা হয়। স্মরণাতীত কালের যে বদ্ধ সংস্কার, তাহার বিরুদ্ধে যাহারা অভিযান করিবে—ছোট-খাটো অনেক বিধানকে তাহাদের আজ কঠোরতার সহিত অগ্রাহ্যই করিতে হইবে। দুই-চারিজন সমাজের তথাকথিত "পতি" হয়তো এই আজ্ঞানুবর্ত্তিতার অভাব দেখিয়া তাহাদের নিন্দা করিতে পারেন কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ দরবারে কোনো দিনই তাহাদের প্রাপ্য সম্মান হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে না।

গোত্রান্তরিত কন্যার পুনর্বিবাহে গোত্র সমস্যা

শাস্ত্রে গোত্র শব্দের অর্থ লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে। কোনো কোনো শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছেন যে গোত্র শব্দের

অর্থ বংশ; আবার কেহ কেহ বলেন প্রত্যেক ঋষির শিষ্য এবং প্রশিষ্য বংশপরম্পরা তাঁহার নামে পরিচিত হইত এবং সেই হইতে আজো হিন্দুমাত্রেই কোনো না কোনো ঋষির নামে বংশ পরিচয় দিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বকালে ঋষিমাত্রেরই গোধন ছিল এবং রাজ-প্রদত্ত গোচারণ ভূমিও ছিল। যাহারা একত্রে একই ভূমিতে গরু চরাইত, তাহারা তৎকালে একই গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত হইত।

শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া যক্ষ, রক্ষ, দানব, দৈত্য, দেবতা মানব এমন কি ম্লেচ্ছ ও যবন পর্য্যন্ত পরস্পর জ্ঞাতি-ভাই। হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ বা বিরাট পুরুষ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মা মানস শক্তিতে সর্ব্বপ্রথম সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমারকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ না হইয়া ভগবানের আরাধনায় মগ্ন থাকিলেন। সৃষ্টি প্রচারার্থে ব্রহ্মা পুনরায় দশ প্রজাপতি সৃষ্টি করিলেন; যথা,—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু, প্রচেতা, ভৃগু, বশিষ্ঠ, নারদ। ইঁহাদের দ্বারা সৃষ্টির বিকাশ হেতু ব্রহ্মা দুই অংশে বিভক্ত হইলেন, পুরুষ ও নারী। পুরুষ অংশের নাম স্বায়ম্ভুব মনু—নারী অংশের নাম শতরূপা। ইঁহাদের সংযোগে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকুতি, দেবহূতি, প্রসূতি নামে তিন কন্যার সৃষ্টি হইল। মনু-কন্যা দেবহূতির সহিত ব্রহ্মার ছায়া-পুত্র কর্দ্দম ঋষির বিবাহ হয়, এবং ইঁহাদের সংযোগে সাংখ্য-

কার ভগবান কপিল ও কলা, অনুসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতি, শান্তি নামে নয় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই নয় কন্যার মধ্যে প্রথম আটটীর সহিত যথাক্রমে ব্রহ্মাঃসৃষ্ট প্রজাপতি, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও বশিষ্ঠের বিবাহ হয়; এবং শান্তির সহিত ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট অন্যতম প্রজপতি অথর্ব্বর সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রজাপতি মরীচির পুত্র কশ্যপ প্রচেতস দক্ষের ২৭টী কন্যাব প্রাণি গ্রহণ কবেন, এবং ইহাদের সংযোগেই দেবতা হইতে জল, স্থল, ও আকাশগামী সমুদয় জীব জন্তুর সৃষ্টি হয়। দেবতা, দানব, মানব দৈত্য, ও রাক্ষস একই ঋষির ঔরসজাত ও একই প্রচেতস দক্ষের কন্যাদের গর্ভোৎপন্ন। সম্বন্ধে ইহারা প্রত্যেকে দাসভূত বা বৈমাত্রেয় ভাই।

গোত্র শব্দের অর্থ যদি বংশই হইবে আর গোত্রান্তর অর্থ যদি বংশ পরিবর্ত্তনই বুঝাইবে তাহা হইলে, মরীচির সহিত স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসজাতা কন্যার গর্ভোৎপন্ন সন্তানেব কি করিয়া বিবাহ সম্ভবপর হইল? মরীচি ও স্বায়ম্ভুব মনু একই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন।

অন্যদিকে মরীচি-পুত্র ঋষি কশ্যপের ঔরসজাত সন্তান ইন্দ্রের সহিত কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দনুর গর্ভজাত সন্তানের কন্যা শচীর বিবাহ হয়। ইন্দ্র, শচীর পিতার আপন বৈমাত্রেয় ভাই। অথচ সেদিন গোত্র সমস্যা কাহারো মনেই উদয় হয় নাই।

গোত্র শব্দের অর্থ বংশ হইলেও কিছু আসে যায় না। বিবাহের সময় পিতা, পিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের নাম উল্লেখ করিয়া এবং তৎপর বংশ জ্ঞাপক গোত্র পরিচয়ের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইতে এই বুঝিতে হইবে যে বর ও কন্যার পরস্পর পরিচয় প্রদানই গোত্রোল্লেখের একমাত্র উদ্দেশ্য। শাস্ত্রও নির্দ্দেশ করিতেছে,—

বর গোত্রং সমুচ্চার্য্য প্রপিতামহ পূর্ব্বকম্।
নাম সঙ্কীর্ত্তয়েদ্বিদ্বান কন্যায়াশ্চৈব মেব হি॥

—উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত।

বরের প্রপিতামহ পূর্ব্বক গোত্র উচ্চারণ করিয়া নাম উচ্চারণ করিবে; কন্যারও এইরূপ।

বংশের আদি পুরুষের পরিচয় প্রদান করিয়া যেমন প্রথম বার বিবাহ হইবে পুনর্ব্বিবাহের সময়ও ঠিক তেমনি আদি পুরুষের পরিচয় দান করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

বিবাহের পর যেমন পিতা মাতার নাম বদলাইয়া যায় না—ঠিক তেমনি বংশও বদলাইতে পারে না।

গোত্র শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই বলিয়াছি অধিকাংশ ব্যক্তির মতে বংশ পরিচয়। গোত্রান্তরিত হওয়ার অর্থ সেই ঘরের কন্যা বুঝাইবে না—ইহার অর্থ অমুক গোত্রীয় অমুকের স্ত্রী। অর্থাৎ কাশ্যপ গোত্রের যদি কন্যা হয় আর ভরদ্বাজ গোত্রের

হয় বর তবে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত কন্যার পরিচয় থাকিবে কাশ্যপ গোত্রোদ্ভবা এবং বিবাহের পর তাহার পরিচয় হইবে ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব অমুকের পত্নী।

প্রথম স্বামী দেহত্যাগ করিলে কন্যার পুনর্বিবাহের সময় আবার তাহাকে নিজের পরিচয় দ্বারাই বিবাহ সিদ্ধ করিতে হইবে; এবং বিবাহের পর আবার সে স্বামীর গোত্রেই পরিচিতা হইবে।

গোত্রান্তরিত কন্যার পুনর্বিবাহ যাঁহারা অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের জন্য একটি উদাহরণ দিব। সকলেই জানেন দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এবং ইহাও সত্য যে যুধিষ্ঠিরের সহিত সর্ব্বাগ্রে বিবাহ হয়। যুধিষ্ঠিরের সহিত বিবাহকালে নিশ্চয়ই দ্রৌপদীর গোত্রান্তর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল; দ্রৌপদী তখন কুরু গোত্রীয়; ইহার পর আবার যখন ক্রমান্বয়ে ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির সহিত বিবাহ হইল—তখন কোন্ শাস্ত্র অনুসারে তাহা হইয়াছিল? গোত্রান্তর হইলে যদি বংশ পরিবর্ত্তনই বুঝাইবে এবং গোত্রান্তরিত কন্যার যদি বিবাহ অসম্ভবই হইবে তাহা হইলে দ্রৌপদীর বিবাহ হইল কেমন করিয়া?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—মানবতা, শাস্ত্র এবং সাধারণ বুদ্ধির বিচারে যাহারা পরাভূত হইয়াছিল, অনন্যোপায় হইয়া তাহারাই এই সব অযৌক্তিক কূট প্রশ্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আজ একটা কথা ভুলিলে চলিবে না—

জাতিকে বাঁচাইবার জন্য কোনো ত্যাগই যথেষ্ট নহে। মৃত্যু বরণ করাও যে কার্য্যে পর্য্যাপ্ত নয়, সে কার্য্যের জন্য এই সব বিচারের কোনো প্রকার আবশ্যকতা আমরা স্বীকার করি না।

বিবাহের মন্ত্র হইবে কি ?

কোন্ কোন্ বিধান, ব্যবস্থা ও মন্ত্রানুযায়ী বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইবে, ইহা লইয়াও অনেকে মাথা ঘামাইয়া থাকেন। পরাশর, মনু, কাত্যায়ন, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, প্রভৃতি ঋষি যখন বিধবা বিবাহের বিধান দিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই ইহার একটা পথও তাহারা ভাবিয়া থাকিবেন। অন্য জাতির "ঘর করা" এবং হিন্দুর বিবাহ এক কথা নহে। হিন্দুর বিবাহ দশবিধ সংস্কারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কার। আজ আমরা অধঃপতিত, অতীতবিস্মৃত গোলামের জাতি; পরানুকরণ ও দাসসুলভ দুর্ব্বলতাই আজ আমাদের সম্বল! কিন্তু এমন দিনই চিরকাল ছিল না। এই জাতিরও একটা গরিমাময় প্রদীপ্ত অতীত ছিল। সেই অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে আমরা দেখি হিন্দুর বিবাহের মতো সাম্য, মৈত্রী ও সেবার আদর্শ কোনো জাতির কোনো সামাজিক আচার ব্যবহারে দৃষ্ট হয় না। হিন্দু ব্যক্তিগতভাবে কোনো

সংস্কারই সম্পন্ন করিতে পারে না ;—হিন্দুর শাস্ত্র ব্যষ্টির কল্যাণ ও স্বার্থ তত দেখে না, যতখানি লক্ষ্য করে সমষ্টির। এই সমষ্টিকে লইয়াই হিন্দুর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান।

* * * *

দুটী অনবদ্য প্রাণ ব্যাকুল তৃষ্ণা লইয়া পরস্পরকে পাইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে কিন্তু শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিলেন,—হে মানব, তোমাদের এ মিলন, ব্যক্তিগত সুখ ও তৃপ্তির জন্য নহে। একমাত্র সমাজ ও দেশের বৃহত্তর ও মহত্তর সেবার অনিবার্য্য দায়িত্বই তোমাদের এই মিলনে আবদ্ধ করিল। তাই, এই গুরুভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তোমার দেবতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর,—স্বর্গস্থ পিতৃপুরুষকে শ্রদ্ধা নিবেদন কর, গুরু ও পুরোহিতের মঙ্গল নির্দ্দেশ মাথায় লও ; ডাক তোমার আপন সম্প্রদায়ের স্বজন ও বান্ধবদের, অন্তঃপুরের রুদ্ধ অর্গল মুক্ত কর পুরঙ্গনার মধুর অধর সংঘাতে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠুক—কল কাকলীতে দিগন্ত মুখরিত হোক ; ডাক তোমার সমাজের শিল্পীকে—তার তুলিকার তন্ময় রেখাপাতে তোমার মিলন-বেদী অনুরঞ্জিত হোক,—বাদিত্রকের অপূর্ব্ব রাগ-রাগিণীর ঐকতান-মূর্চ্ছনা বিশ্বের দুয়ারে এই মিলন-বারতা পৌঁছাইয়া দিক ; তোমার ফুল্ল কুসুম-কাননের সেবক লইয়া আসুক তার সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পসম্ভার, চন্দন-পৃক্ত শুভ্র কেতকী-কুন্দের মাল্য, তুমি তোমার প্রেমের দেবতাকে বরণ করিয়া লও ; মশালচী আসিয়াছে তার প্রদীপ্ত দীপ

শিখায় তোমার ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ উজ্জ্বল করিয়া দিতে—ধোপ-নাপিত, কলু-তেলী, কাহাকেও তুমি আজ উপেক্ষা করিতে পারিবে না। হে ভবিষ্যৎ সমাজের সৃষ্টিধর! করজোড়ে অবনত মস্তকে সকলের কাছে অনুমতি প্রার্থনা কর; সকলের আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গল বচন মাথায় লইয়া আজ নূতন করিয়া সংসারে প্রবেশ কর।

এই সাম্যের মহাবারতা ও মিলন-পথের গোপন সার্থকতা একদিন হিন্দুমাত্রেরই মনের দর্পণে সর্ব্বক্ষণের জন্য প্রতিভাত হইত। আজ হিন্দু সেকথা ভুলিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের মরীচিকার মোহ তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে; তাই সে ঘরকে পর করিতে এতো ব্যস্ত।

যাক্ যাহা বলিতেছিলাম: যাঁহারা বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা মন্ত্রও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। **কুমারীর বিবাহ যে যে মন্ত্রে—যে যে আচার ও ব্যবস্থানুযায়ী সম্পন্ন হইবে,—বিধবার বিবাহও তদনুযায়ীই করিতে হইবে।** তাহা না হইলে বিধবার বিবাহ মন্ত্র অন্য প্রকারে তাঁহারা বিধিবদ্ধ করিতেন।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপক্ষে যুক্তি

বহু সম্প্রদায়ের কন্যার অভাবে ধ্বংস—বিধবার সংখ্যাধিক্য; রক্ষিতা জীবন; ভ্রূণ-হত্যা; সতিত্ব ও মাতৃত্বের লোপ।

বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে যতপ্রকার মতবাদ আছে তাহার আমরা আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়, এমন আরো কতগুলি কারণ আছে যাহার জন্য বিধবা বিবাহ বর্ত্তমানে একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু জাতির কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও, তাহার সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও সামাজিক পারম্পর্য্য হইতে আমরা অনেক তথ্য ও সমস্যার মীমাংসা পাইয়া থাকি। এবং এই বিরাট প্রাচীন জাতির বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যও শুধু আমাদের মনকেই যে পদে পদে বিস্মিত করিয়া তোলে তা নয়, বহু বিদেশী এবং বিধর্ম্মী, যাহারা শুধু সমালোচনার দৃষ্টি লইয়াই এ-দেশকে বিচার করিবার প্রয়াস পায়, তাহারাও কম মুগ্ধ বিস্ময়ে এই জাতির পায়ে শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুর বিধান চিরকালই ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির কল্যাণকেই বড় করিয়া দেখে। জাতির আত্মরক্ষার জন্য আপাতদৃষ্টিতে যাহা পাপ ও অন্যায় বলিয়া মনে হয় হিন্দু তাহাও সমাজে প্রচলিত করিতে কোনো দিনই দ্বিধা

বোধ করে নাই। এ জাতি অমৃতের অধিকারী সত্য কথা—কিন্তু অমৃতের সন্ধান করিতে যাইয়া যে গরলের উদ্ভব হইল—সে তাহাও পরিত্যাগ করিল না। ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য। হিন্দুর শাস্ত্রে ন্যায় ও অন্যায়, পাপ ও পুণ্যের ধারাবাহিক এবং চিরস্থায়ী তালিকা নাই। যুগের পরিবর্ত্তনে, পাত্রের ব্যতিক্রমে এই পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হইয়াছে।

এই মাপকাঠীতে জাতির বিচার হইত বলিয়াই,—দ্রৌপদী-কুন্তী আজো হিন্দুর আদর্শ রমণী—জবালা-অহল্যা, তারা ও মন্দোদরী জাতির কাছে চিরপূজ্যা। এই হিসাবেই সত্যকাম বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইবার স্পর্দ্ধা করেন, ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস আখ্যায় ভূষিত হন—মহাতাপস বিদুরের ঘরে স্বয়ং পার্থসারথী বাঁধা পড়েন। ম্লেচ্ছকন্যা শুকীর গর্ভজাত পরম ভাগবত শুকদেব, অনার্য্য-কন্যা উলুকার গর্ভ সম্ভূত মহর্ষি কণাদ, উর্ব্বশীর গর্ভোৎপন্ন মহাতপা বশিষ্ঠ জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহাদের বিসর্জ্জন দিয়া জাতি আজ টিকিয়া থাকিবে কোন্ সম্বল লইয়া এবং কিসের অধিকারে ?*

* জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদশ্চ তথোলুক্যাঃ সুতোঽভবৎ॥
(৪২ অধ্যায়, ব্রাহ্মপর্ব্ব, ভবিষ্যপুরাণ।)

অপিচ—

দাসী গর্ভ সমুৎপন্নো নারদশ্চ মহামুনিঃ॥
শুকী গর্ভ সমুৎপন্নো কৌশিকশ্চ মহামুনিঃ॥
নাভাগাদিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ, বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
৯—১১ অঃ হরিবংশ।

এই প্রয়োজনেই বিধবা বিবাহ একদিন এই হিন্দু সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ;—ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজনীয়তা বিধবার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহা একদিন রহিত হইয়াছিল ; আজ আবার জাতি একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করিয়াছে বলিয়াই বিধবার বিবাহ অনুমোদন করিতেছে।

১৯২১ সালের আদমস্থুমারী অনুসারে সমগ্র বঙ্গে হিন্দু রমণীর সংখ্যা ৯৯,৫০ ৮১৫ ; আব এই সংখ্যার মধ্যে ১৫,২৮,-৮০৩ বিধবা ; সমগ্র বিধবার মধ্যে ২,৯৪,০৬৯ বালবিধবার সংখ্যা। জাতি যে কেমন করিয়া আজো বাঁচিয়া আছে—ইহাই ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাংলার এক তৃতীয়াংশ হিন্দু পুরুষ কন্যার অভাবে বিবাহ করিতে পারে না, আর সেই দেশে বালবিধবার সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ।

বাংলাদেশের ১২ লক্ষ ব্রাহ্মণ, ১১ লক্ষ কায়স্থ এবং ১ লক্ষ বৈদ্য ছাড়া আর সকলকেই বিবাহের সমস্যা নিরাকরণের জন্য মাথা ঘামাইতে হইতেছে। আর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যেও যে বহু সংখ্যক পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না, তাহাও আমরা বলিয়াছি। এই হিসাবের জন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না—যাহার যাহার গ্রামের দিকে তাকাইয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। আজ চার খানা গ্রাম মিলাইয়া একটী নাপিত খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর ; গ্রামের যারা সেরা যোয়ান, যাদের ঘর সংসার একদিন লোকের কোলাহলে হাট বাজার বলিয়া ভ্রম

হইত, সেই বাগ্দী, নমঃশূদ্র, পাট্নী, ভূইমালী, ডোম, মুচী আজ ক্রমে ক্রমে নির্ব্বংশ হইয়া যাইতেছে। সূত্রধর দেশ হইতে লোপ পাইল, কামারের শূন্য ভিটা খা খা করিতেছে —কলু ও ধোপা উজাড় হইয়া গিয়াছে। কাহারো ঘরে তিনটী ছেলে আর পাঁচটী বিধবা মেয়ে—কাহারো ঘরে ছেলের বালাই নাই—নিজে বিপত্নীক—চোখের সম্মুখে সোমত্ত বিধবা কন্যা চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ যেমন বরপণের আধিক্যে ধ্বংসের পথে দ্রুত আগাইয়া যাইতেছে ঠিক সেই অনুপাতে বাংলার মেরুদণ্ড প্রায় অন্যান্য সম্প্রদায়ও কন্যাপণের নির্ম্মম পেষণে জীবন্মৃত। উচ্চবর্ণ তবুও পথের ফকীর হইয়াও বিবাহ দিতে পারিতেছে—কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায় টাকা জোগাড় করিতে না পারায় বিবাহই অনেকের ভাগ্যে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। পণের টাকা ও বিবাহের পর খাইবার সংস্থান করিতে করিতেই চুল পাকিয়া যায়, দাঁত নড়িতে থাকে,—চক্ষু ঝাপসা ও দেহ শিথিল হইয়া পড়ে;—বুকের সাহস যেন বুক ছাড়িয়া আকাশে যাইবার জন্য ব্যগ্র; অন্যদিকে বহুকষ্টে একটী মাত্র দশ বছরের পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—সেটাও হাত ছাড়া হইয়া যায়। বর্ত্তমানের নৈরাশ্য ও ভবিষ্যতের ব্যর্থতার করুণ চিত্র তার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে; এই অর্দ্ধ বৃদ্ধ তখন বাড়ী, ঘর, ঘটী, বাটী সব মহাজনের কাছে বাঁধা দিয়া লাল চেলী ও টোপর সংগ্রহ করে। পিতা-

পিতামহের বংশ—বিবাহ না করিলে যে ধ্বংস হইয়া যায়! অধীর আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যতের কত রঙীন চিত্র বুকে লইয়া সে নববধূকে বরণ করিয়া লয়। নববধূর চোখের ও নাকের জল শুকাইতে না শুকাইতে—একদিকে মহাজনের তাগাদা অন্যদিকে পেটের অগ্নি, তাহার কলিজার রক্ত আঁচলে আঁচলে শুষিয়া খায়। তবু আশা ছাড়িতে পারে না—বুক বাঁধিয়া সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতে থাকে; কেবলি মনে পড়ে তার—এ যে বাপ-পিতামহের বংশ!!......পাঁচ বৎসরও কাটিবার সময় পায় না,......সে দিন... ..আর আসেও না... ...বাপ পিতামহের বংশ ধ্বংস করিয়া বাংলার এমনি কত হতভাগা চলিয়া যাইতেছে।

ওদিকে পোনেরটা বছরও পূর্ণ হইবার অবকাশ পায় নাই; হতভাগিনার হাতের চুড়ী, পরণের কাপড় ও গলার মালা কাড়িয়া লইয়া সমাজ সেই মুহূর্ত্তেই জানাইয়া দিল—তুই বিধবা। জন্মের মতো তোর সুখ-সাধ-আহ্লাদ ঘুচিয়া গেল; হাসি বুকের বাহিরে আসিতে চাহিলে গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে,—কান্না? তাও লোক চক্ষুর অন্তরালে—সংগোপনে। মানুষের সম্মুখে তোর কাঁদিবারও অধিকার নাই। পিপাসায় যদি কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে—কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতে হইবে—দুঃখে যদি বুক ভাঙ্গিয়াও যায়, কথা কহিতে পারিবি না—নির্জ্জন অন্ধকার কারাকক্ষে শুধু দুদিনের স্বপ্ন লইয়া সারা জীবন তোকে কাটাইতে হইবে;—তুই যে ব্রহ্মচারিণী!—মানে

জানিস্ না?—কি করিতে হইবে তাহা কেহ বলিয়া দেয় নাই?—তাতে কি?—শুধু তুই জানিয়া রাখ তুই বিধবা—একজন ছিল তোর—সে আজ নাই। ব্যস।........

* * * *

পেটের দায় বড় দায়। পোড়া পেটের তাগিদে গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার-বাড়ীতে চাকুরী লইতে হইল। সারাদিন অফুরন্ত খাটুনী, পাঁচ বছরের শিশু হইতে মরণ-পথের যাত্রীর নিকটও গঞ্জনা, লাঞ্ছনা ও ভাতের খোঁটা খাইয়া গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিতে হয়। কিন্তু বিধবার কপাল, তাতেও সোয়াস্তি নাই। এতো দুঃখ—এতো নির্য্যাতন—এতো অনাহার—তবু এ ছার দেহের আনাচ কানাচ হইতে পোড়া যৌবন বিদায় তো লয়ই না—আরো যেন বেশী করিয়াই আত্ম-প্রকাশ করে। হায় যৌবন! এতোদিন কোথায় ছিলে? তোমার প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া একজন যে চিরকালের মতোই বিদায় লইল!......সেই ভক্ত পূজারী......দীর্ঘ পাঁচ বৎসর তোমার আবাহন করিয়াছে......কিন্তু......থাক্।...... জমিদারের আগমনে চিন্তার আর অবসর রহিল না।

জমিদার বড় ভাল মানুষ। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ; কপালে তাঁর চন্দনের তিলক, গলায় মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা—মাথায় টিঁক; এই ত্র্যহস্পর্শ সংযোগে সমাজ মধ্যে তাঁর অসীম প্রতিপত্তি। আহা, হতভাগিনী অকালে সব খোয়াইয়া বসিয়া আছে—তাই তিনি একটুখানি কৃপা দেখাই-তেই না উহার বাড়ীতে এমন করিয়া নিজে যাচিয়া আসেন...।

কৃপার ভর বড় বেশী দিন সহিল না।......অকস্মাৎ একদিন জমিদার হতভাগিনীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া বলিয়া দিলেন যে......"পেটের ওটাকে ফেলিয়া দিতে হইবে।" নতুবা তার ছায়াও নাকি সমাজ মাড়াইতে অস্বীকার করিয়াছে।......সেই যে প্রথম,—তাই সে বিমূঢ় বিস্ময়ে একবার চমকাইয়া উঠিল। ......আর্ত্তনাদ করিয়া কতবার কাঁদিল, কতবার বলিল,...... "ওগো, বংশ বাঁচাইবার জন্ম না বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলে...... আজ আমি"......কাঁদিবার অবসর নাই। জমিদারের আবার তলপ আসিল।.....তারপর কেহ জানিল না......কেহ কিছু শুনিলও না......কোন্ সে সত্যকাম ইচ্ছা করিয়াও জাতির নিকট আর আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পাইল না।... একবার...দুইবার...আর হতভাগিনী কাঁদে না...আর্ত্তনাদ করিয়া সেই "একজন"কে কোনো কথা আর জানায় না। সে বুঝিতে পারিয়াছে—হিন্দুর ঘরে জন্মাইলে ইহাই করিতে হয়।

প্রথম ছিল স্বর্গের দেবী সে; তার পর হইয়াছিল মানবের সংস্পর্শে মানবী......আর আজ? .....আজ সে পিশাচিনী।

সতিত্ব ও মাতৃত্ব এই লইয়াই নারীর নারিত্ব। সমাজের "পতি" গলা টিপিয়া গভীর নিশীথে সতিত্বকে একদিন নিজের হাতে হত্যা করিল;—অবশিষ্ট ছিল তার মাতৃত্ব— আজ তাও হারাইয়া সর্ব্বহারা রিক্তা সে;—বিশ্বের দুয়ারে তাহার আজ পরিচয়—"নরকস্থ দ্বারং।"

এই নরকের দ্বারেই বর্ত্তমান সমাজের সৃষ্টি ; তাই সমাজে আজ মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; পশুর আস্তাবলে সমাজ পরিণত হইয়াছে। মানবতার নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনার আঘাত তাই সমাজের বুকে আজ আর বেদনার সৃষ্টি করিতে পারে না।

দীর্ঘ দশ বৎসর সমাজ ও দেশ সেবার পবিত্র ব্রত মাথায় লইয়া পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি —যে দৃশ্য চোখে দেখিয়াছি,—ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি,—তাহা ছাড়া একটা কথাও বেশী বলিতেছি না। শুধু তাই নয়,—আমার মনে হইতেছে,—অনেক কথাই বলা হইল না।

হিন্দু সমাজে বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক হিসাবে রক্ষিতা রাখা প্রচলিত হইয়াছে। অনেক স্থলে, ইহার নাম "সাঙ্গা" বলে। বহু পুরুষই অর্থ সমস্যায় বিব্রত হইয়া বিবাহ করিতে পারে না—কিন্তু দেহের ও সংসারের প্রয়োজনে তাহাকে নারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই সব বিধবা প্রকাশ্যভাবে "অমুকের বিধবা" বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না। সমাজে ইহাদের একদিন একটা উৎসব করিতে হয় ; বলা বাহুল্য এই উৎসবে একমাত্র ভোজনই উপকরণ। সামাজিকভাবে সেই দিন হইতে ঐ বিধবা নির্দ্দিষ্ট পুরুষের রক্ষিতা বলিয়া স্বীকৃতা হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের কথা, ইহাদের সংযোগে সন্তান সম্ভাবনা হইলে সমাজে তাহা

দুষ্কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়; কাজেই এই দুষ্কার্য্য গোপন করিতে প্রত্যেকেই ভ্রূণহত্যার জঘন্য ও পৈশাচিক পথের পথিক হইতে বাধ্য হইয়া থাকে।

যাঁহারা উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচার করা যুক্তি-যুক্ত মনে করেন না, তাঁহাদের অবগতির জন্য এস্থলে উল্লেখ করিতেছি যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়েও ভ্রূণ-হত্যা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। শরীরের ধর্ম্ম শরীর পালন করিবেই,—মনের ধর্ম্মও মন অবহেলা করিতে পারে না। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। মন এবং শরীর বৈধব্য স্বীকার না করিলে—বাহিরের কতকগুলা আচার তাহাকে বিধবা করিয়া রাখিতে পারে না। শাসনমূলক কপট বৈধব্যই এই অবস্থাকে দিন দিন আরো জটীল হইতে জটীলতর করিয়া তুলিতেছে।

বিধবা বিবাহের নাম শুনিয়া যাঁহারা "রসাতল" "রসাতল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, তাঁহারা কেমন করিয়া যে ভ্রূণহত্যা সহ্য করিতেছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা। ভ্রূণহত্যার পর কোনো নারীইতো শাস্ত্রনিরুপিত অশৌচ প্রতিপালন করে না; অথচ এই অবস্থায় তাহার হাতেই বিগ্রহের পূজার্চ্চনার উপকরণ সজ্জিত হয়—ভোগ প্রস্তুত হইয়া কত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের রসনা পরিতৃপ্ত করে। এই নারী নিজের হাতে নিজের প্রাণ পুতুলীকে হত্যা করিয়া সমাজের সম্মুখে জোড় করিয়া মুখের হাসি ফুটাইয়া রাখে—অন্তরের অব্যক্ত যাতনা নীরবে সহ্য করিয়া সংসারের সব

কাজই তাকে করিতে হয়। মানবতার কৈফিয়ৎ অপেক্ষা শাস্ত্রের বচন যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মনে করেন—কেমন করিয়া তাঁহারাই যে জানিয়া শুনিয়া এ "বিষ" হজম করেন এবং পরক্ষণেই সমাজে ব্রাহ্মণেতর জাতির হাতের জল চলিবে কি চলিবে না—নমঃশূদ্রের ছায়া মাড়াইলে কোথায় স্নান করিতে হইবে এবং কতবার গায়ত্রীজপ করিয়া পরিশুদ্ধ হইতে হইবে প্রভৃতি বিষয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে মন্তব্য প্রকাশ করেন—আমরা তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। সামনা সামনি এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইঁহারা উত্তর করিয়া থাকেন যে শাস্ত্রেরই নাকি ইহা ভবিষ্যদ্‌বাণী, কলিকালে নাকি ইহা হইতেই হইবে! এ লাখ কথার এক কথার উপর আর যুক্তি চলে না।

দুই-চারিজন সংস্কৃত জানা পণ্ডিত আসিল কি গেল তাহা আজ হিসাব করিলে চলিবে না। প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু মৃত্যুর ব্যাদান বদনে ছুটিয়া যাইতেছে—ভগবানের অভি-শাপের চাইতেও ভয়ঙ্কর—দৌর্ব্বল্য, ক্লীবতা ও আত্মঘাতী কাপট্য দিন দিন জাতিকে গ্রাস করিতেছে; বিধর্ম্মীর কবলে পড়িয়া হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে—ইহা সত্ত্বেও আমরা নিজের অবস্থা একবার যখন জানিতে পারিয়াছি —দীর্ঘ কালের ঘুমন্ত জাতি যখন একবার আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছে, তখন এ জাতিকে বাঁচিতেই হইবে। বাংলার তরুণের দল! এই মৃত্যু-সায়র হইতে হিন্দু জাতিকে বাঁচাইবার যে অমোঘ দায়িত্ব তাহা আজ স্বেচ্ছায় মাথা

পাতিয়া তোমাকে লইতেই হইবে। জাতির অন্তর্দেবতার ইহাই আজ তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ বাণী।

২।

ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুর বর্ত্তমান রূপ

জনসংখ্যার অল্পতা, বিধবার বৃদ্ধি, নারীধর্ষণ, ধর্ম্মান্তরিত বৃদ্ধি, বারাঙ্গনার বৃদ্ধি, ঝি ও হোটেলের ঠাকুরাণী, ভেকধারিণী বৈষ্ণবী।

ফরিস্তায় আমরা পাই, হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটী। আজ হিন্দু ২১ কোটী। এক হাজার বৎসরে ৪০ কোটী হিন্দু বিনষ্ট হইয়াছে। ১৮৮১ সালের আদম শুমারীতে ভারতে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৭৬ জন ছিল; ১৯১১ সালে উহা ৬৯ জনে দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ ৩০ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৫ জন কমিয়াছে। আর ১৯২১ সালের গণনায় উহা শতকরা ৬৫ জনে পৌছিয়াছে। সুতরাং এই গতিতে হিন্দুর সংখ্যা কমিতে থাকিলে ৪২০ বৎসরে ধরাধাম হইতে হিন্দুর চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তখন আসীরীয়া ও ব্যাবিলোনীয়া বাসীদের ন্যায় আমাদের নামও ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেদিন গবেষণা আরম্ভ হইবে। কত ঐতিহাসিক তাঁহার চিন্তা ও কার্য্যকারিতায় সফল হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট যশ ও খ্যাতি লাভ করিবেন। একটা জাতি, যাহার এতোবড়

অতীত ছিল—যাহার জ্ঞান ও কর্ম্মের কথা আজো জগতের চিন্তাধারা অলোড়িত করিতেছে—যাহার শৌর্য্য বীর্য্যের কাহিনী জগতের সাহিত্য ও কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহার নিজের বলিতে কিছুই থাকিবে না।

অন্যদিকে, ১৮৮১ সাল হইতে ১৯২১ সালের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা এক বাংলা দেশে ৫০ লক্ষ কমিয়া গিয়াছে আর মুসলমানের বাড়িয়াছে ৪৬,৭৬,৯৭৬ অর্থাৎ হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে প্রায় দ্বিগুণ।

এই সঙ্গে দেখিতে পাইতেছি ১৯১১ সালে ১ বৎসরের কম বয়স্ক বিধবা ছিল ৮৬৬, আর ১৯২১ সালে উহা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে, এক হাজার ছয় শতের উপর। ১৯২১ সালের গণনায় বাংলা দেশে মোট বিধবা ২৫, ১৮, ৮০৩, আর তার মধ্যে বাল বিধবা ২,৯৪,০৬৯ জন। ঐ সালের আদম শুমারীতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি, বিপত্নীকের সংখ্যা ৫,৫৬,৩৬১ তে দাঁড়াইয়াছে। ধ্বংস আর কাহাকে বলে !

আজো যাহারা নস্য নাকে লইয়া কোমর বাঁধিয়া তর্ক করিতে আসেন তাঁহারা কি সত্য সত্যই জ্ঞান হারাইয়াছেন ? —অথবা আজ অমর বিভীষণের আত্মা ইঁহাদের দেহকে আশ্রয় করিয়া জাতিকে হত্যা করিবার আয়োজনে উত্তেজিত করিতেছে।

হিন্দুর বৈধব্য জীবনের নির্লজ্জ অত্যাচারের সুযোগ লইয়া বিধর্ম্মীর দল পৈশাচিক আনন্দে দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু বিধবার অসহায় অবস্থা—তাহার দেহ ও মনের উপর

জঘন্য পীড়ন, একদিকে তাহাকে যেমন পাপের পথে প্রলোভিত করিতেছে—অন্যদিকে এই একান্ত অসহায়তার সুযোগ লইয়া বিধর্ম্মী দস্যুর দল দানবীয় দম্ভে হিন্দু বিধবাকে হরণ করিতেছে। বাংলার ঘরে ঘরে এই পৈশাচিক নারীধর্ষণ অতি মর্ম্মান্তিক রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সমাজের উপেক্ষা ও অমার্জ্জনীয় নিশ্চেষ্টতা একদিকে যেমন ঐ দস্যুর দলকে সাহসী করিয়া তুলিয়াছে—হিন্দু বিধবার পরিপূর্ণ নিটোল যৌবন অন্যদিকে ঐ কামান্ধ কুক্কুরদের ঠিক সেই পরিমাণেই ক্ষিপ্ত করিবার সুযোগ দিয়াছে।

অপহৃত হিন্দু বিধবার গর্ভজাত সন্তান লইয়াই বাংলার মুসলমান সমাজ আজ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। একটু বিচক্ষণ স্থির মীমাংসায় যাহাদের দ্বারা আমরা সমাজ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিতাম, নিজেদের অবিমৃশ্যকারিতায় ও দৌর্ব্বল্যে তাহাদেরই গর্ভজাত সন্তানের হস্তে আজ হিন্দুর দেব বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণিত হইতেছে—হিন্দু জননীর মুসলমান সন্তান আজ হিন্দুর মাথার দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে—এবং প্রতিমুহূর্ত্তে ঐ মাথার রক্ত মাটীতে মিশাইয়া দিবার জন্য ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছে। যে বিধবার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল গো-সেবা—তাহারই গর্ভোৎপন্ন সন্তান আজ গরুর রক্তে স্নান করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে।

ইহাতেই যদি শেষ হইত, তবু মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম। তবু বুঝিতাম, অন্তত মানুষের সমাজে থাকিয়া

সে হয়তো সুখেই সংসার করিতেছে। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বিধাতার রুদ্র অভিশাপ ক্রমেই এ জাতিকে আশার আলোর নিকট হইতে নৈরাশ্যের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে নিক্ষেপ করিতেছে। সমাজের উশৃঙ্খল অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সংখ্যাতীত হিন্দু-বিধবা বারাঙ্গনার জীবন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। নীচে আদম শুমারীর সংখ্যা হইতে দেখাইতেছি।

বঙ্গে ও আসামে হিন্দু জনসংখ্যা,—

২, ৭৩, ৩৫, ৯৩৬

আর মোট বারাঙ্গনার সংখ্যা,—

বাংলায়, ৬৪,৫৮৩
আসামে, ৭,২২৩
মোট, ৭১,৮০৬

সমাজপতি! তোমার মুদিত চক্ষু ক্ষণকালের জন্য একবার উন্মোচন কর। তোমারি সৃষ্ট সমাজের রূপ একবার প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ কর। এই লক্ষ হিন্দু রমণীকে কে পথের বাহির করিয়াছে?—কে উহাদের স্বর্গের দেবী হইতে নরকের কীটে রূপান্তরিত করিয়াছে? উহাদের ইহকাল, পরকাল— অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তোমার করুণার রক্তাক্ত শকট কেমন নির্ম্মম পীড়নে হত্যা করিয়াছে—একবার ভাল করিয়া দেখ। একবিন্দু করুণার জন্য আজ উহারা লালায়িত—একটু স্নেহের পরশের জন্য উহারা আজ পাগল; বুভুক্ষু মাতৃত্ব আজ

চিৎকার করিয়া নিজের পরিপূর্ণ ব্যর্থতা প্রচার করিতেছে। ক্লেদাক্ত ক্ষত উহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—তুমি না ঘৃণায় মুখ ফিরাইতেছ! ও ক্ষত কাহার করুণার দান সমাজপতি? ভাবিওনা এ দিন এমনি ভাবেই কাটিবে। ভগবানের রুদ্র বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে—যুগ যুগ সঞ্চিত তোমার এই অত্যাচারের প্রতিফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে। মনে রাখিও সে দিন অতি নিকটে,—সে দিন এই মরনোন্মুখ সমাজ বিপ্লবের লাল নিশান উড়াইয়া দিয়া তোমার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

উপরের হিসাব কেবল প্রকাশ্য বারাঙ্গনার সংখ্যা। ইহা ছাড়া কে না জানে, কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় সহরে অসংখ্য বিধবা রমণী ঝির বেশ ধারণ করিয়া বারাঙ্গণার বৃত্তি চালাইতেছে? দিনের বেলা ইহারা হোটেলে বা বাসায় ঝির কার্য্য করিয়া থাকে আর রাত্রে ইহারা প্রকাশ্য ভাবেই নিজেদের দেহের বিনিময়ে অর্থ উপার্জ্জন করে। তারপর আরো এক শ্রেণীর বারাঙ্গনা আছে; বড় বড় সহরের প্রায় প্রত্যেক মেসে বা হোটেলে, ষ্টেষণের নিকটবর্ত্তী হোটেলে ইহারা বাস করে। হোটেলের কর্ত্তার রক্ষিতা রূপেই ইহারা থাকে কিন্তু ইহাদের সন্তান জগতের কেহ দেখিতে পায় না। সকলেই জানে বাজারের বেশ্যার সহিত ইহাদের জীবনের এতটুকুও পার্থক্য নাই। কিন্তু কলির পতিতপাবনগণ নির্ব্বিবাদে ইহাদের হাতের জল ও মুখের পান খাইয়া জীবন সার্থক করেন। হতভাগিনীদের, একদিকে দিনের

বেলা অজস্র পরিশ্রম, অন্যদিকে সারারাত্রি কদর্য্য দৈহিক অত্যাচারে জীবনের আয়ু ও শান্তি অকালে ফুরাইয়া আসে। কিন্তু আর তো কোনো উপায় নাই; অমানুষ পরিপূর্ণ এই হিন্দু-সমাজ তাহাদের এই ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছে।

বাংলা দেশে ইহাদের সংখ্যা—

১,০১,৯২৪

আর আসামে

১৫,২৯৬

মোট ১,১৭,২২০

এই খানেই শেষ নহে। শাস্ত্রাচারী নামধারী কতিপয় পণ্ডিত ও তথাকথিত সমাজপতি কি নির্ম্মম অত্যাচারে এই সমাজের বক্ষস্থল ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, ইহাকে নির্জ্জীব করিয়াছে, রক্ত চোষার মতো অন্তরিক্ষে থাকিয়া কেমন করিয়া জাতির জীবনী-শক্তি দিন দিন শোষণ করিয়াছে, তাহার নিখুঁত ইতিহাস আমাদের আজ সংগ্রহ করিতে হইবে, পচা নালী-ঘা আর ঢাকিয়া রাখিলে চলিবে না, —সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রোপচারে ইহাকে আজ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। বাহিরের আলো ও বাতাস স্পর্শে হয় নূতন শক্তি লাভ করিয়া সমাজ আবার বাঁচিয়া উঠুক, নতুবা এমনি করিয়া তিলে তিলে পচিয়া মরা অপেক্ষা একদিনে পৃথিবী হইতে বিদায় নিক।

বাংলা দেশে ১,৮২,২১৪ জন বৈষ্ণব; আর ২,১৯,৬৫৩ জন বৈষ্ণবী। অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা ৩৭,৪৩৯ জন বেশী। ইহার ফলে একই পুরুষের নিকট একাধিক রমণী আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয় ইহাদের খুব একটা বড় সংখ্যা বিধবা। পুরুষের সহিত সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীর ন্যায় বাস করিয়াও ইহারা সন্তান রক্ষা করে না। এই সব বৈষ্ণবী কোথা হইতে সংগ্রহ করা হয়? একদিকে, কামার, কুমার, সূত্রধর, নাপিত প্রভৃতি সম্প্রদায় কন্যার অভাবে বিবাহ করিতে না পারিয়া নির্ব্বংশ হইয়া গেল,—অন্যদিকে বাংলা দেশের বেওয়ারীশ ভেকধারিণী বৈষ্ণবীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ঐ কামার, কুমার* প্রভৃতি সম্প্রদায় হইতেই এই সব বৈষ্ণবীদের আমদানী হয় বেশী করিয়া। হয় বৈধব্য অসহ্য মনে করিয়া স্বেচ্ছায় এই ঘৃণিত জীবন উহারা গ্রহণ করে—অথবা অনেক স্থলে ব্যভিচারী পুরুষের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য ইহারা এই সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বিধর্ম্মী কর্তৃক ধর্ষিতা বহু নারীও অনন্যোপায় হইয়া এই সমাজে আত্মগোপন করিয়াছে।

এই যে লক্ষ লক্ষ নারীর জীবন, সমাজের অন্ধ কুসংস্কারের ফলে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে—দিন দিন জাতি অন্তঃসার শূন্য নির্জ্জীব হইয়া উঠিতেছে—ইহার জন্য দায়ী কে?

করুণার সাগর তাই বড় ব্যথিত কণ্ঠেই বলিয়াছিলেন,—

হে ভারতবর্ষীয় মানবগণ, আর কতকাল তোমরা মোহ

নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিবে? একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার ভ্রূণ-হত্যা পাপের স্রোতে নিমজ্জিত হইতে বসিয়াছে। তোমরা দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছ। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। এবার শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হও। তাহা হইলেই তোমাদের জন্মভূমির কলঙ্ক দূর হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমরা কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, তাহাতে আশা করা যায় না। যে তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন ও দেশাচারের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাস দোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে যে হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদিগের কঠিন হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয় না; এবং ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা দর্শনে তোমাদের মনে ঘৃণার উদয় হয় না। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা, ভগ্নী ও পুত্রবধূ প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত, তাহারা দুর্নিবার কামরিপুর বশীভূত হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ এবং ধর্ম্মলোপ ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জা ভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে সম্মত আছ কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন করিয়া পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য

যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ।............

"দুর্ভাগ্য ক্রমে যাহারা অল্পবয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহা বোধ হয়, চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তি' মাত্রেই স্বাকার কবিবেন। অতএব হে পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন—বিধবা-বিবাহের প্রথা পুনঃ প্রচলন করিয়া হতভাগা বিধবাদিগের বৈধব্য যন্ত্রণা নিরাকবণ এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত নিবারণ করা উচিৎ কিনা ?"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বুকের রক্ত দিয়া লেখা বিলাপ, বাঙ্গালীর ধ্যানের মন্ত্র—বাংলার বিধবা জীবনের য়ণ ও মহাভারত।

সমাজে বিধবার প্রকৃত স্থান।

আহার ও পরিচ্ছদ; নির্জ্জলা একাদশী; ব্রহ্মচর্য্যের প্রত্যক্ষ রূপ; দাসীবৃত্তি; বিধবার গুপ্তহত্যা ও দেশত্যাগ; বিধবার জেলবাস। দায়ভাগের আলোচনা।

নারী জাতির কল্যাণকর যে কোনো ব্যবস্থা সমাজে

প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিলেই, একদল লোক সমাজে আছে যাহারা সত্য সত্যই ভাবিয়া থাকে, তাহাদের ও সমাজের ইহাতে ঘোর অনিষ্ট ও অকল্যাণ হইবে। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো মহৎ ও বৃহৎ কল্পনা ইহারা সহ্য করিতে পারে না—অথবা ক্ষমতা থাকিলেও ইচ্ছা করিয়াই তাহা করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে না। পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এই মনোবৃত্তি সমাজে বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দু সমাজে নারীজাতির শিক্ষার কোনো প্রকাব ব্যবস্থা ছিল না; এমন কি বিদ্যা শিক্ষা করিলে স্ত্রীলোকের বৈধব্য যে অবধারিত, এই কুসংস্কার সমাজে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, এখনো প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহু সংখ্যক পুরুষ আছে যাহারা গৃহকর্ম্ম, সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকেব আব কিছু করণীয় আছে বা থাকিতে পারে তাহা স্বীকার করে না। মহাত্মা রামমোহন যে দিন সতীদাহ প্রথা রদ কবিবাব চেষ্টায় তন্ময়,—সেদিনও এই শ্রেণীর লোক তাঁহার গন্তব্যপথে কম বিপত্তির সৃষ্টি করে নাই। যেদিন বাংলা দেশেব হাজার বৎসরের অন্ধ-কারাগৃহের দুয়ার খুলিয়া দিয়া পরলোকগত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর নারীর সম্মুখে প্রকৃতির এক নূতন রূপ খুলিয়া ধরিলেন—সেদিন এই রক্ষণশীল দল ক্ষিপ্তের মতোই চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। তারপরে যেদিন মহাপ্রাণ বেথুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা দক্ষিণা রঞ্জন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রামগোপাল

ঘোষ প্রভৃতি কর্ম্মবীরগণের সাহচর্য্যে বাংলায় স্ত্রী-শিক্ষার গোড়া পত্তন করিলেন,—এবং পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনে সমগ্র দেশ যেদিন আগাইয়া যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল, সেদিনও এই ধুরন্ধরগণ ক্ষান্ত ছিল না। অথচ কথায় কথায় ইহারা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর জন্য গর্ব্ব অনুভব করে; গার্গী, মৈত্রী, বাক্, লীলাবতী, ক্ষণা, উভয়ভারতীর নামে ইহারা দিগন্ত মুখরিত করিয়া তোলে; নারী-জাতিকে ইহারা না কি গৃহলক্ষ্মী বলিয়া পূজা করে, মনুর, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা" বচন উদ্ধৃত করিয়া ইহারা দেখায় যে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তাহারাই জানে কেমন করিয়া নারীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হয়, এবং ইহার নাকি জীবন্ত প্রমাণ হিন্দুর বিধবার জীবনেই দ্রষ্টব্য।

এই শ্রেণীর লোক জীবনের প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসারে প্রবেশ করে যে, কোনোক্রমেই কথায় ও বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্য দেখান হইবে না। নতুবা এতোবড় নির্জ্জলা মিথ্যা কথা ইহারা উচ্চারণ করিতে পারিত না।

হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর উপর —স্ব ইচ্ছায় হোক অথবা দায়ে পড়িয়া হোক, বিশেষ অত্যাচার ইহারা করিবার সাহস করে না; কিন্তু বিধবার উপর ইহারাই যে পাশবিক অত্যাচারের প্রবর্ত্তক, সে বিষয়ে কোনো প্রকার সংশয় করিবার কিছু অবশিষ্ট ইহারা রাখে নাই। এক বছর হইতে ১৫ বছরের বিধবাকে আহার ও পরিচ্ছদে

হিন্দু সমাজ যেমন করিয়া পীড়ন করিয়াছে, তাহা ভাবিলে সত্য সত্যই চক্ষু সজল হইয়া ওঠে। ১০।১৫ বছরের দুধের মেয়ে, সংসারের কি-ইবা জানিল—আর কতখানিই বা বুঝিল!—জগতের সকল প্রকার কামনা ও বাসনার দ্বার রুদ্ধ করিয়া ইহারই সম্মুখে সমাজ প্রাণ ভরিয়া পৈশাচিক আনন্দে উদ্দাম নৃত্য করিতে লজ্জা বা কুণ্ঠার এতটুকু পরিচয়ও দেয় না। দুধের কচি মেয়েকে সাদা কাপড় পরাইয়া কোন্ প্রাণে ঐ পিশাচ পিতা নিজের বৃদ্ধা স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য নিত্য নূতন নূতন পোষাক আমদানী করে? কোন রাক্ষসের প্রাণ লইয়া ঐ সোণার পুতুলীকে নিরাভরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর জন্য নূতন গহনার ফরমাইস দিয়া থাকে? উহার যে কাপড়ের রং দেখিবার সখ্ আজো মেটে নাই; হতভাগিনী, মায়ের পরণে নূতন কাপড়ের রঙীন পাড়ের দিকে যখন আকাঙ্ক্ষার ব্যগ্র দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া থাকে—তখন হায় রাক্ষসী জননি! কোন পাষাণের প্রাণ লইয়া ঐ প্রস্তরীভূত মূর্ত্ত বিষাদকে তুমি সহ্য কর? তোমার নূতন গহনার সহিত যখন হতভাগিনী নিজের শূন্য হস্তের তুলনা করে,—ঐ ভাঙ্গা বুকের অন্তস্থল হইতে যে উগ্র উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস তখন ফুটিয়া বাহির হয়, তাহা যে তোমার সকল কল্যাণ, সুখ ও ভবিষ্যৎকে পোড়াইয়া খাক্ করিয়া দেয়।

তারপর আহারের কথা :— কি হইবে নূতন করিয়া আর বলিয়া? কত জন্ম-জন্মান্তরের মহাপাপের প্রাক্তন লইয়া

হিন্দু সমাজে বিধবা নারীর সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু নির্য্যাতন—শুধু অবিচার—শুধু লাঞ্ছনার তীব্র কষাঘাৎ তাহার ভোগের জন্য সমাজ ব্যবস্থা করিয়াছে। মাসের মধ্যে ১৫ দিন উপবাসের ব্যবস্থা করিয়াও সমাজ নিশ্চিন্ত নহে; একবেলা আহার—তাহাও পেট পূরিয়া নাকি খাইবার উপায় নাই। ব্রহ্মচর্য্য যদি ছুটিয়া যায় !!

চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, মাছ-মাংস আরো কত কি—তাহাতেও তোমার নিবৃত্তি নাই: ক্ষুধা নাই—ঔষধ খাইয়া ক্ষুধার সৃষ্টি করিতেছ—অতিরিক্ত খাইয়া স্বস্তি পাইতেছনা—সোডা লেমনেড বা আগ্নেয় ভস্ম খাইয়া উদ্গার তুলিতেছ;—আর ওদিকে হয় ১৫ বছরের বালিকা—আর না হয় ৮০ বছরের বৃদ্ধা, সারাদিনের পর একটুখানি কচু সিদ্ধ, কুমড়ার ডাঁটা ভাজা অথবা বড় জোর যে কোনো থোর ডাঁটার ঘণ্ট, এই খাইয়া শুকনো গলায় ভাত গিলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। বিধবার দেহ—কোনো প্রকারে দিনটা কাটানো। ভাত গিলিতে না পারিয়া জলে উদর পূর্ণ করিয়া একদিনের জন্য বিধবা হবিষ্য শেষ করিল!

কাল একাদশী; তাতে কি? কে তার খোঁজ রাখে? বাড়ীতে ছেলের ভাবী শ্বশুর বাড়ী হইতে তেল হলুদ তত্ত্ব আসিয়াছে; গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া ঝি চাকর সবাই আনন্দে মসগুল। বুড়ি দিদিমা বহু ঘা খাইয়া খাইয়া সংসারের ধাঁচ শিখিয়া লইয়াছেন; কিন্তু নির্ব্বোধ বালিকা সংসারের কোনো কিছুই তো আজো জানিতে পারে নাই!

বড় আনন্দ করিয়াই দাদার বিয়ের তত্ত্ব দেখিতে আগাইয়া যাইতেছিল! হতভাগিনী তো জানেনা—যে সংসারের সে শনি,—সমাজের ধূমকেতু—শুভ কার্য্যের মূর্ত্তিমতী অভিশাপ। আনন্দ চুলায় যাক্—চোখের দেখা তাও হইলনা! শুধু লাঞ্ছনার আঘাতই ছিল তার ভাগ্যের প্রাপ্য—তাহাই লইয়া ফিরিয়া আসিল।

পুরাঙ্গনার কলকাকলী ঝি চাকরের আনন্দ চীৎকার "দীয়তাং নীয়তাং" শব্দের অফুরন্ত কলরবে বাড়ী মুখরিত;—অন্যদিকে গৃহের এক কোনে লোক-চক্ষুর অন্তরালে দুটী ভাগ্য-বিরম্বিতা নারী,—একটা বৃদ্ধা, একটা বালিকা,—পিপাসায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। যন্ত্রনায় বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে চায়—তবু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই;—আজ যে বিধবার একাদশী! বুকের ভিতরে দাবদাহ, পেটে অগ্নির তীব্র জ্বালা—দেহের চারিদিকে যৌবনের বুভুক্ষা;—এই ত্রয়ীর নির্ম্মম পেষণে প্রাণ যে বাহির হইয়া যায়। দানব সমাজ,—আবার জ্বালিয়া দেও সেই চিতাগ্নি—এক লহমায় সব নিঃশেষ হইয়া যাক্। হায় রাজা, শ্মশানের চিতাই নিবাইয়া দিলে—কিন্তু এ চিতার কথা তো তুমি জানিতে না; জানিলে বুঝিতে, এ চিতা সে চিতার চাইতেও কত তীব্রতর!

সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ বিধবার তপ্তশ্বাসে সত্য সত্যই সোণার বাংলা শ্মশানের চিতাভস্মে পরিণত হইয়াছে। বাংলার সকল কল্যাণ, সকল সত্য, সকল মঙ্গল তাই আজ

বাংলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। এ বিধান মানবের ধর্ম্ম নহে, ইহা দানবের ধর্ম্ম।

বাংলার কবি তাই গাহিতেছেন,—

"সুজলা এই বাংলাতে হায় কে করেছে সৃষ্টি রে?
নির্জ্জলা ঐ একাদশী কোন দানবের দৃষ্টি রে?
শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল জ্বলে গেল বাংলা দেশ
মায়ের জাতির নিশ্বাসে হয়, সকল শুভ ভস্ম শেষ"।

ছেলে বেলায় মনে করিতাম,—একাদশীর সঙ্গে বুঝি বা সত্য সত্যই ধর্ম্মের বড় বেশী সম্বন্ধ। কিন্তু আজ বুঝিতেছি, প্রচলিত একাদশীর সহিত ধর্ম্মের কোনো প্রকার সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। একাদশ ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া শ্রীভগবানের ধ্যানে নিজেকে ডুবাইয়া রাখাই একাদশীর মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র এবং সধবা ও বিধবা প্রত্যেককেই এই একাদশী ব্রত পালন করিতে শাস্ত্র আদেশ করিতেছেন। শাস্ত্র বলিয়া দেন নাই,—যে সমাজের সকল স্ত্রী পুরুষ সেদিন আকণ্ঠ ভোজন করিয়া কয়েকজন হত-ভাগিনীকে নির্জ্জলা অবস্থায় কয়েদ করিয়া রাখা হোক। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রানাঞ্চৈব যোষিতাম্।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥ ৬

—বৃহন্নারদীয়ে একাদশী মাহাত্ম্যারম্ভে।

হে দ্বিজগণ! কি বিপ্র, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি নারী, যে কেহই হোক, ভক্তি সহকারে বিষ্ণুর প্রীতিকর একাদশী ব্রত সাধন করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারে।

অষ্টাব্দাদধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণাশীতি বৎসরঃ।
ভুঙ্‌ক্তে যো মানবো মোহাদেকাদশ্যাং সপাপকৃৎ॥
—কাত্যায়ন স্মৃতি।

৮ম বর্ষীয় বালক হইতে অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ পর্য্যন্ত যে মানব মোহ বশত একাদশীর দিন ভোজন করিবে সেও পাপভাগী হইবে।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথ বা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংস মেব হিঃ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা যতি যে কেহ হোক না কেন, হরিবাসরে বা একাদশীতে আহার করিলে গোমাংস ভক্ষণ করা হয়।

শাস্ত্র নিরপেক্ষ ভাবেই বিধান প্রদান করিয়াছেন। অন্ধ সমাজ শাস্ত্রবাক্য উপেক্ষা করিয়া বিধবার দুর্ব্বহ জীবনকে আরো অধিকতর দুর্ব্বিসহ করিবার জন্য এই পক্ষপাত ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছে।

এই তো উপবাস করিবার ব্যবস্থা; ইহা ছাড়া, শাস্ত্র স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছে যে অশক্ত পক্ষে সকলেই ফল জল গ্রহণ

করিতে পারে। এই ব্যবস্থা আবার বাংলার সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে। পশ্চিম বাংলার কোনো কোনো জেলায়, পূর্ব্ব বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই একাদশীর দিন রাত্রে বিধবারা জল ও ফল মূলাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। বারেন্দ্র সমাজেই নির্জ্জলা একাদশীর প্রতাপ বেশী। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলাম, মৈমনসিংহের কোনো স্থানে একাদশীর দিন ১৫।১৬ বছরের একটী বিধবা মেয়ের কলেরা হয়। একাদশীর দিন জল দিলে হতভাগিনীর ইহকাল তো গিয়াছেই পাছে আবার পরকালও জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় সদাশয় পিতা-মাতা তাহাকে জল না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু বিধবার কণ্ঠ বা বুক তাহা শুনিতে এবং বুঝিতে চাহিল না; ফলে এক ফোটা জলের জন্য ক্রমাগত সে অধীর হইয়া উঠিল। সমস্ত দিন-রাত্রি কাটাইয়া জল জল করিতে করিতেই হতভাগিনী সকল যন্ত্রনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল।

শাস্ত্র কিন্তু ইহা বলিতেছেনা। আমারা নিজের চোখে দেখিয়াছি, কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক বিধবা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং ইহা সত্য যে একাদশী বিচার করিয়া জ্বর দেখা দেয়না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া গেলেও এক ফোটা জল খাওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া সকলেই মনে করে।

এই যে ধর্ম্মের নামে মোহ সত্য সত্যই ইহা বাংলার মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়াছে। এবং পৃথিবীর যেখানে যেদিন

এই মোহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই দেশই ধ্বংসের মুখে দ্রুত ছুটিয়া গিয়াছে।

এই মোহ ক্ষমতা অক্ষমতা বিচার করে না—পাত্রাপাত্রের হিসাব দেখে না—পরওয়ানা লটকাইয়া দিলেই ইহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। আজ যদি বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট, চিরকালের জন্য নহে—একদিনের জন্যও সমগ্র দেশকে বাধ্যতা-মূলক উপবাস করিতে আজ্ঞা দেয়, তাহা হইলে, আজ যাহারা মুখ বুজিয়া চোখের সামনে নারী হত্যার তৃপ্তিপ্রদ দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে—তাহারাই তোড়-জোড় করিয়া টাউনহলে গলা বাজি করিতে আরম্ভ করিবে। আর ঠিক এই কারণেই আজ দেশের প্রতিবাদের কোনোই প্রতিকার হয় না। প্রতিবাদ করিতে হইবে কিসের?—অন্যায়ের, অত্যাচারের, অবিচারের; তা সে অবিচার অত্যাচার দেশের লোকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হোক আর গভর্ণমেণ্টের দ্বারাই হোক্। অত্যাচার,—অত্যাচার; পাত্রভেদে ইহার কদর্য্য নৃশংস রূপ পরিবর্ত্তিত হয় না। তাই যখন দেখিতে পাই উগ্রপন্থী রাজনীতিক সমাজের জঘন্য আচরণ ও বিভৎস প্রথাকে শুধু অপসারিত করিতে চেষ্টা করিতেছে না, তাহা নহে—পরন্তু পরোক্ষ ভাবে সমর্থন করিতেছে,—আর চরম-পন্থী সমাজ-সংস্কারককে যখন দেখি চোখের সম্মুখে ব্যক্তি-গত স্বার্থের জন্য কিম্বা একটা মিথ্যা বিভিষিকার দরুণ গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের কোনো প্রকার প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া অতি নীচ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছে,—তখনই

বুঝিতে পারি ইহাদের সত্যকার উদ্দেশ্য এবং দেখিতে পাই বাস্তব রূপ। ইহারা অত্যাচারের প্রতিকার চায় না,—এরা চায় নিজেদের খামখেয়ালী চরিতার্থ করিতে। তাই কি রাজকীয়, কি সামাজিক কোনো অত্যাচারের প্রতিকারই আমরা করিতে পারিতেছি না।

যাক্। অক্ষমতা বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র একাদশী সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিতেছেন,—

নক্তং হবিষ্যান্নমনো দনম্বা ফলন্তিলাঃ ক্ষীরমথাম্বুচাজ্যম।
যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাপি বায়ুঃ প্রশস্তমত্রোত্তর মুত্তরঞ্চ॥

বায়ুপুরাণে নক্তাঙ্গ ব্রত।

রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন, অন্ন ব্যতীত অন্য দ্রব্য, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য বা বায়ু এই সমস্ত বস্তু পরস্পর উত্তরোত্তর প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার "একাদশীতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে বিধবার জল পানাদি অনুকল্প সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

অষ্টৌতান্য ব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণ কাম্যাচ গুরোর্বচন মৌষধং॥

—একাদশী তত্ত্বধৃত বচন।

জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণের ইচ্ছা, গুরুর বাক্য ও ঔষধ এই আটটী ব্রত হনন জন্য দোষে দোষাবহ নহে।

আরো বলা হইয়াছে,—

অনুকল্পো নৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি।
মূলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবেচ্ছুভং॥

(নারদীয়ে)

যাহারা ক্ষীণ, দুর্ব্বল তাহারা ফল, মূল, দুগ্ধ ও জল পানাদি অনুকল্প করিতে পারে।

আরো বহু বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পাবে, কিন্তু আমরা তাহা করিব না। একটা কথা বুঝিলেই বিষয়টী অনেক পরিমাণে সহজ ও সরল বলিয়া বোধ হইবে। পশ্চিম বঙ্গ ও পূব্ব বঙ্গের অধিকাংশ বিধবা একাদশীর দিন জল পানাদি কবেন; একাদশীতে জল খাইলে যদি সত্য সত্যই নবকগামী হইতে হয় তাহা হইলে এই বহুসংখ্যক বিধবাকে নিশ্চয়ই বিনা প্রতিবাদে নবকে যাইতে হইবে। বাংলা দেশের এতোগুলি বিধবাই যদি নরকে যাইতে পারে, তাহা হইলে আর দুই চারিজনকে উপবাসী রাখিয়া স্বর্গে পাঠাইয়া কি এমন বড় কাজ হইবে?

আমরা বহুবার বলিয়াছি, প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের আমরা একান্ত পক্ষপাতী, একটা অতুল্য প্রেমের আদর্শ বুকে ধরিয়া চিরকাল যোগিনার ন্যায় কাটাইয়া দেওয়ার যে চিত্র তাহা সত্য সত্যই অপূর্ব্ব; কিন্তু দেখিতে হইবে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় উহা সম্ভব কিনা এবং কতদূর সমীচীন। বর্ত্তমান সমাজে কোনো প্রকার ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ অবশিষ্ট নাই; ভ্রষ্ট জীবনের যে কদর্য্য অনাচার তাহাই সমাজের একমাত্র

সম্বল। আজ যদি বুঝিতাম একজন পিতাও কন্যার বৈধব্য স্মরণ করিয়া তাহার সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে—যদি দেখিতাম একটী ভাইও ভগ্নীর দুর্ভাগ্যের সাথী হইয়া চিরকুমার-ব্রত ধারণ করিতেছে —তবুও না হয় বলিতে পারিতাম, এ সমাজে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করা সহজসাধ্য; কিন্তু যেখানে বৃদ্ধ পিতা, বাল-বিধবা কন্যার অপেক্ষা না করিয়া যোড়শী ভার্য্যার সন্ধানে ব্যস্ত—যেখানে শিক্ষিত ভ্রাতা সদ্য বিধবা ভগ্নীর সম্মুখে নবপরিণীতা তরুণী স্ত্রীর সহিত প্রেম-কলরবে দিগন্ত মুখরিত করিতে দ্বিধা বোধ করে না—সে সমাজে ব্রহ্মচর্য্যের বিধান দেওয়া খুবই সহজ তাহা আমরা জানি—কিন্তু পালন করা শুধু দুষ্কর নহে—প্রায় অসম্ভব। তবুও আজো যে সমাজে দুই চারিজন প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী দেখিতে পাওয়া যায়—উহা সত্য সত্যই ভগবানের একটা বিরাট অনুকম্পার প্রকৃত নিদর্শন।

আমরা যাহাকে ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া আজকাল প্রচার করিতেছি উহা মোটেই ব্রহ্মচর্য্য নহে; প্রকৃতপক্ষে সমাজের শাসনে বহু সংখ্যক রমণী নিতান্ত দায়ে পড়িয়া এই বাধ্যতা-মূলক জীবন গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ ইহাদের জীবনে কতটুকু আছে? সংসারের দাসীবৃত্তি করিতেই তো ইহাদের জীবন কাটিয়া যায়। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের প্রতি-পালনের ভার—অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা ও আহারের আয়োজন, দেব বিগ্রহের পূজা ও সেবার যাবতীয় অনুষ্ঠান

এই বিধবাদেরই করিতে হয়। ইহা ছাড়া, ভাইএর সংসারে বিধবা ভগ্নীকে নিছক দাসীবৃত্তি দ্বারাই ভ্রাতৃবধুর মনোরঞ্জন ও সঙ্গে সঙ্গে ভাইএর সন্তোষ উৎপাদন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়। আমরা জানি, বাংলার হিন্দু সমাজে খুব কম বিধবাই নিজের পারলৌকিক চিন্তার অবসর পায়; এমন কি একাদশীর দিন, "পোড়া পেটের" "বালাই" নাই বলিয়া সংসারের কাজ বেশী করিয়া করিতে হয়। এক কথায় নিখরচায় এমন সম্পত্তি বাংলার হিন্দু সমাজে আর দ্বিতীয়টী নাই। কাজেই বিধবা বিবাহের কথা বলিতে গেলেই এক শ্রেণীর লোক এমন করিয়া ক্ষেপিয়া ওঠে। এমন সম্পত্তি কি হাত-ছাড়া করা যায়? বিধবা বাড়ীতে না থাকিলে—কে এমন করিয়া শরীর পাত করিয়া সংসারের সেবা করিবে?—কে তাহার পুত্র কন্যার তত্ত্বাবধান করিবে? —কে বিগ্রহকে উদ্ধার করিবে?

বিধবা জীবনের প্রকৃত রূপ প্রচারিত হইলে এই শ্রেণীর স্বার্থপর সংসারী লোকের স্বার্থের বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইবে; কাজেই একটা ধর্ম্মের আবরণ উহারা রাখিতে চায়। ধর্ম্মের নামে এজাতি কি না করিয়াছে?—নিজের হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়াছে; পিতা-মাতা হইয়া নিজের বুকের দুলালকে হত্যা করিয়াছে; ধর্ম্মের নামে হিন্দু সমাজ নিজের কন্যাকে বেশ্যা সাজাইতে দ্বিধা বোধ করে না (দেবদাসী ইত্যাদি), ভণ্ড, লম্পট ও গঞ্জিকা-সেবী "সাধু"র সেবায় পুত্রকে নিয়োজিত করিয়া গৌরব

অনুভব করে। ধর্ম্মের নামে এই জাতি নরহত্যার বিভৎস উল্লাস প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিয়াছে, পরনারীর সতিত্বের বিনিময়ে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছে; আর এই ধর্ম্মের দুর্জ্জয় মোহাবরণে থাকিয়া নিতান্ত সাধারণ জীবনকেও হিন্দু বিধবা ব্রহ্মচর্য্য ও উচ্চতর জীবন বলিয়া ভুল করিয়া থাকে। এই মোহ, দাসীবৃত্তির জঘন্য রূপকে লুকাইয়া রাখিয়াছে— ব্যভিচার, অসত্য ও দুরন্ত অনাচারকেও ধর্ম্মের মুখস পড়াইয়া সমাজের পূজা আদায় করিয়াছে।

ধর্ম্মের নামে এই অত্যাচার ও মহাপাপ সমাজ-বক্ষ হইতে অপসারিত করিতে হইবে। নতুবা বর্ত্তমান হিন্দু সমাজকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার আর কোনো উপায় নাই।

ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চিৎকারের ফলে, সমাজের ধর্ম্ম তো রসাতলে গিয়াছেই, উপরন্তু সহজ সরল জীবনের যে সাধারণ সত্য তাহাও হিন্দু হারাইয়া ফেলিয়াছে। শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, সমাজের শাসন ও প্রেম নাই; শুধু পাঁতি দেখাইয়া সমাজ, মানুষকে ধাম্মিক করিতে চায়। একই উপাদানে পুরুষ ও নারীর শরীর ও মন গঠিত, তাহা সমাজ জানিয়াও বুঝিতে চায় না; আর এই জাগিয়া ঘুমাইবার দরুণই অসংখ্য হিন্দু বিধবা গৃহত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজনের মায়া-মমতা কাটাইয়া দূরদেশে নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতেছে। আজ হিন্দুব তীর্থক্ষেত্রগুলি এই দেশান্তরিত হৃতভাগিণীদের সমাধিস্থানে পরিণত হইয়াছে। যে দুই

চারিজন রাক্ষসীর প্রবৃত্তি লইয়া নিজের বুকের ধনকে হত্যা করিতে রাজী না হয় এবং চেষ্টা করিয়াও যাহাদের ভ্রূণ-হত্যা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহাদের সকলেরই ঐ কাশী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানই অগতির গতি হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহারা কাশী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই একথার সত্যতা স্বীকার করিবেন। তারপর আমরা আরো একটা কথা জানি যাহা শুনিলে সত্য সত্যই নিজের জীবনের উপর পর্য্যন্ত ধিক্কার জন্মিয়া যায়। বহু ভদ্র ঘরের বিধবাকে কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জীবন বলি দিতে হয়। পাপ যখন আর লুকাইয়া রাখা যায় না—হয়তো চেষ্টা করিয়াও ভ্রূণহত্যা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় না, তখন অনেক পিতা মাতা নিজের হাতে নিজের সন্তানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়া থাকে। ইহা অতিরঞ্জিত উপন্যাস নহে—আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

পল্লীগ্রামে এই বিষাক্ত এবং সর্ব্বনাশী মনোবৃত্তি বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়াও আরো অনেক প্রকারেই হিন্দু বিধবা অকালে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। নানাপ্রকার বিষাক্ত লতা পাতা ও বিষ দ্বারাই সাধারণত গর্ভ নষ্ট করা হয়; ইহার ফলে অনেক বিধবা সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও মরণের হাতে সঁপিয়া দিয়া পিতা-মাতা ও বংশকে কলঙ্কের হাত হইতে রক্ষা করে।

বাংলার বৈধব্য জীবনের করুণ কাহিনী বহু রোমাঞ্চকর উপন্যাসকেও ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে। একটু অনুসন্ধান করিলেই

এমন সব ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়, যাহাতে সত্য সত্যই আজ আবার সহমরণকেই পরম কাম্য বলিয়া মনে হয়। বাংলার এই চিন্তাশীল ও বিজ্ঞ মস্তিষ্ক প্রসূত নূতন নূতন জঘন্য মরণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রত্যেক বিধবা আজ মুহূর্ত্তের অগ্নি যন্ত্রনা শতগুণ তৃপ্তিদায়ক মনে করিবে।

হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অর্থ-ব্যবস্থাও বিধবা-জীবনকে কম দুর্ব্বহ করিয়া তোলে নাই। বাংলা দেশের দুই চারিজন জমিদার ঘরের বধূ ছাড়া প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ঘরে বিধবার জীবন এই অর্থ-সমস্যায় আজ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। দায়-ভাগের নিয়মানুসারে বিশেষ উইল করা না থাকিলে কোনো বিধবাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় না; ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা থাকিলেও সজ্জন ও সাধু প্রকৃতির আত্মীয়-স্বজনের সুব্যবস্থায় বিধবা হইবার দুই চারি বৎসর পরই সে আশায় নিরাশ হইয়া হিন্দু বিধবাকে পিতা-মাতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অধিকাংশ স্থলেই বালবিধবার ভাগ্যে উইল লাভ করা ঘটিয়া ওঠেনা; কেননা জীবিতাবস্থায় প্রায় ক্ষেত্রেই স্বামী বেচারা সম্পত্তির মালিক হইবার অবকাশ পায় না; পিতা মাতার জীবদ্দশায় কিঞ্চিৎ সুখ সুবিধা বজায় থাকিলেও তাহাদের অভাবে বিধবা জীবনের দুঃখে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়া যায়। স্বামীর ভিটায় বিধবার ভরণ-পোষণের স্বত্ব থাকিতেও স্থান নাই,—অন্যদিকে ভ্রাতৃবধূর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাইএর দুর্ব্যবহার তাহার জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে।

দায়ভাগের কি প্রকার পরিবর্ত্তন হওয়া উচিৎ তাহার আলোচনা আমরা করিতে চাহি না—কিন্তু পরিবর্ত্তনের যে নানা প্রকারেই অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। জানি, একথা উত্থাপন করাতে অনেকের নিকটেই অর্ব্বাচীন এবং আরো অনেক সুমিষ্ট বিশেষণে ভূষিত হইতে হইবে—কিন্তু তবু সমাজের মঙ্গলের জন্যই এ কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

হইতে পারে সংখ্যায় আজো তেমন বেশী কিছু দাঁড়ায় নাই, কিন্তু একজন হউক দুইজন হউক, এ সমস্যা আলোচনা করিতেই হইবে। আমরা জানি বহু বিধবা সন্তান নষ্ট করিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া থাকে ; এবং মোকদ্দমায় তাহাদের দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

ব্রিটিশ ভারতের কারাগার সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। দীর্ঘ আঠার মাস রাজদ্রোহী অবস্থায় বাংলার বিভিন্ন জেলে কাটাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ সমস্যা পর্য্যবেক্ষণ এবং ইহার সামাধানকল্পে চিন্তা করিবার অপর্য্যাপ্ত সময় পাইয়াছিলাম। বাংলার ছোট বড় প্রায় প্রত্যেক জেলার জেলখানায় স্ত্রী-কয়েদীর জন্য একটু স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। সামান্য একটু খানি ঘর, এই ঘরেই সমস্ত রকমের কয়েদীকে আবদ্ধ থাকিতে হয়। বাংলা দেশে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান স্ত্রী-কয়েদীর সংখ্যা বেশী এবং তারপরই বেশ্যা প্রভৃতির স্থান। যে সব ভদ্র ঘরের বালবিধবা সমাজের পুরুষের প্রলোভনে এবং অত্যাচারে এই জেলে বাস করিতে

বাধ্য হয় তাহাদের অপরিসীম দুর্গতি সহজেই অনুমেয়। আর এই প্রকার ঘটনা যে খুবই বিরল তাহা যেন কেহ মনে না করে। জেলে দেখিয়াছি, নির্দোষী পুরুষ কারা-বাসের পর চোর ও চরিত্রহীন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। জেলে থাকিয়া কেহ চরিত্রের কু-অভ্যাস এবং হীন আচরণ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে কিংবা জেলের শাসনে কোনো দোষী ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হইয়াছে—ইহা আমরা—যাহারা জেলে যাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, কোনোদিনই স্বীকার করিব না। প্রকৃতিপক্ষে কারাদণ্ড, দোষীকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় না—হয় গভর্ণমেণ্টের কারখানা পরিচালনা করিবার লোক সংগ্রহ করিবার জন্য।

এ হেন জেলে ভদ্রমহিলার কি যে দুর্বিসহ জ্বালা ও অপমান সহ্য করিতে হয় তাহা বর্ণনা করিবাব উপায় নাই। আর দীর্ঘদিন এই জেলে কাটাইয়া বাহিরে আসিয়াই বা হিন্দু-বিধবার গ্রহণ করিবার মতো কোন্ পথ সম্মুখে থাকে? এক বারাঙ্গনার বৃত্তি গ্রহণ ব্যতিত হিন্দু বিধবা অন্য পথ খুঁজিয়া পায় না। অবশ্য আবো একটা পথ গ্রহণ কবিতে দেখা যায়ঃ—তাহা হইতেছে বিধর্ম্মীর হস্তে আত্ম-সমর্পণ।

এই প্রসঙ্গে ঢাকার মুক্তাময়ী রায়ের কথা মনে পড়িতেছে। ভদ্র গৃহস্থেব কন্যা এবং পুত্রবধু, বালবিধবা অবস্থায় বহুদিন কাটাইয়াছে। কিন্তু এক নরপশুর আক্রমণ হইতে হতভাগিনী নিজেকে অনেকদিন রক্ষা করিয়াও "শেব

রক্ষা” করিতে পারিল না; ফলে সন্তান সম্ভাবনা হইল। লোকের প্ররোচনায়, নিজের কলঙ্কের ভয়ে এবং সমাজের উৎপীড়নে অনেকদিন লুকাইয়া রাখিয়াও শেষে মা হইয়া সন্তান হত্যা করিতে সে বাধ্য হইল। রাত্রে যখন মৃত সন্তানটীকে কাপড়ে জড়াইয়া নদীতে ফেলিতে যাইতেছিল—হতভাগিনী সেই সময় পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়; বিচারে দীর্ঘ দুই বৎসর তাহার কারাদণ্ড হইয়াছে। কিন্তু অসহ্য বিস্ময়ের কথা, যে নরপশুর প্ররোচনায় আজ মুক্তামযী সমাজের চোখে, মানুষের চোখে, বিচারকের চোখে দোষী তাহার কিন্তু কিছুই হইল না, সে পিশাচ সমাজের বুকের উপর স্বচ্ছন্দে বিহার করিবেই, প্রয়োজন হইলে বড় বড় সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেও সে কুণ্ঠিত হইবে না। মনুষ্যত্বের নামে ইহা অপেক্ষা জঘন্য প্রহসন আর কি হইতে পারে?

সমাজের এই যে দুরপনেয় কলঙ্ক, জাতির এই যে লজ্জাকর পরিচয়, একটা প্রাচীন সভ্যতার বুকে এই যে ঘৃণিত নিষ্ঠুর আঘাত,—ইহা বিদূরিত করিতেই হইবে। জানি ইহার অন্তরায় অনেক আছে,—কিন্তু অন্তরায় আছে বলিয়াই ধীর ও স্থির সাধনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বেশী করিয়া।

সেকাল ও একাল

প্রাচীন কালের ও বর্ত্তমান সময়ের উদাহরণ —তথাকথিত নিম্ন বর্ণের প্রশ্নের কৈফিয়ৎ— যুগাচার্য্যগণের মতামত।

আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি যে ভারতীয় সমাজ কোনোদিনই অন্ধের মতো একই বিধান বা একই পন্থা চিরকাল মানিয়া চলে নাই। যখনই প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে—নূতন বিধান সমাজে প্রচলিত করা হইয়াছে, পুরাতনকে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে; এই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই ভারতীয় সমাজ একদিন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল—বিশ্বের দরবারে একদিন শ্রেষ্ঠ আসন ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিল। পরিবর্ত্তন করিবার এই শক্তি ও ইচ্ছা যেদিন ধ্বংস হইয়া গেল—সেইদিনই সমাজের মৃত্যুও অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

এই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই প্রাচীন ভারতীয় সমাজে আমরা ব্যাস, বশিষ্ঠ, সত্যকাম, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেবকে পাইয়াছি, সমাজের এই প্রাণবান ব্যবস্থার ফলেই আমরা বাক্, লোপমুদ্রা, মৈত্রী, গার্গী প্রভৃতির সত্য ও কল্যাণ স্পর্শের উত্তরাধিকারী হইয়াছি,—আর আজ এই পরিবর্ত্তন-শক্তি রুদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান সমাজ পাইয়াছে লম্পট, ভণ্ড ও ব্যভিচারীর অসংখ্য কদর্য্য মূর্ত্তি। বর্ত্তমান ব্যবস্থা

যদি সমাজের পক্ষে শুভকরই হইবে, তবে এই হাজার বৎসরেও একজন ঋষি জন্মগ্রহণ করিলেন না কেন?—আর একখানা গীতা বা উপনিষদের সৃষ্টি হইল না কেন? এক খানা মহাভারতের মতো কাব্য, রামায়ণের মতো গান সমাজ তো সৃষ্টি করিতে পারিল না!

বিধবা বিবাহের মতো মহাপাপ করিয়াও অর্জ্জুন দেব-দানবের সঙ্গে সর্ব্বদা টক্কর মারিয়া চলিয়াছেন, বিভীষণ অমরতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন—সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধুত্বের অধিকার লাভ করিয়াছেন—আর আজ ভ্রূণহত্যা ও ব্যভিচার করিয়া, হে বর্ত্তমান সমাজ, তুমি কি অতুল সম্পদ লাভ করিয়াছ—কোন্ দিব্য শক্তির অধিকারী হইয়াছ?

বর্ত্তমান সমাজের ক্ষীণ দৃষ্টি, অবিমৃষ্যকারিতা, ব্যভিচারের প্রতি বিপুল আসক্তি, শাস্ত্র এবং বাস্তব জীবনের অনৈক্য প্রভৃতি মারাত্মক কলুষতাই সমস্ত প্রকার অধঃপতনের স্রষ্টা। প্রাচীন সমাজে ইহা ছিল না; অনধিকার উপভোগ সেদিনও ছিল—কিন্তু আজিকার এই দারুণ কাপুরুষতা ও গভীর দৌর্ব্বল্য সেদিন দেখা যায় নাই। তাই পাণ্ডব অন্তঃপুরে দেখিতেছি, সুভদ্রাও যেমন সতীর আসনে অধিষ্ঠিতা,—দ্রৌপদী ও উলূপীও তেমনি জনসমাজে সতী বলিয়া পূজিতা। পিতা বিধবা কন্যাকে পাত্রান্তরে দান করিলেও কেহ তাই অশাস্ত্রীয় বলিয়া নাসা কুঞ্চন করিতেছে না। তাই আমরা দেখিতেছি,—ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া স্বর্গ লাভের "নির্ঘাৎ" প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়াও নাগরাজ বিধবা

উলূপীকে অর্জ্জুনের হস্তে পুনরায় সম্প্রদান করিতেছেন। এবং এই বিবাহের ফলেই মহাবীর ইরাবান জন্মগ্রহণ করেন।

অর্জ্জুন স্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্।
সুতয়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা।
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যো হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা॥
—মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ৯১ অধ্যায়।

নাগরাজ কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান নামে এক শ্রীমান, বীর্য্যবান পুত্র জন্মে। সুপর্ণ কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে, নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিষণ্ণা পুত্রহীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলেন।

ইহাছাড়া, তারা ও মন্দোদরীর পুনর্বিবাহ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদ্যুম্ন রাজা শম্বর অসুরকে বধ করিয়া তাঁহার বিধবা রাণী মায়াবতীকে বিবাহ করিয়া দ্বারকায় লইয়া আসিয়াছিলেন।

চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতীর মাধবী নামে একটী রূপবতী কন্যা ছিল। মাধবী চার বার পত্যন্তর গ্রহণ করেন। এবং ইহারই গর্ভে বিখ্যাত নরপতি শিবির জন্ম হয়। বহুপুরুষ গমন-জনিত মহাপাপও শিবির মতো ত্যাগাবতার নরপতিকে সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখিত; আর আমাদের বর্ত্তমান অপাপ-বিদ্ধ ও শুচিতার অন্তরালে সন্তর্পণে রক্ষিত সমাজ সৃষ্টি করে,—কতকগুলি কাপুরুষ, জাল ও মিথ্যার পুজারী

এবং ক্লীব। এ হেন সমাজ কি পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে ? আর পরিবর্ত্তন করিলে যদি পাছে সত্য সত্যই নরকের কোলাহল থামিয়া যায় !!

বর্ত্তমান সময়েও এই প্রাণহীন সমাজের আদেশ ও বিধানকে অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা বালবিধবার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও একেবারে অল্প নহে। "আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি এই প্লক্ষদ্বীপের রাজা দিবোদাসের কন্যা 'দিব্যাদেবীর' বিবাহ ব্রাহ্মণ সমাজের অনুমতি অনুসারে তাহার পিতা একুশবার দিয়াছিলেন, সে পতির মৃত্যুর পরও পুনঃ বাইশ বারের জন্য রাজা স্বয়ংবর-বিবাহের ঘোষণা করিলেন।"

—পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড অঃ ৮৫।

"মালব দেশের এক ব্রাহ্মণ তাহার কন্যাব বিবাহ দশবার দিলেন। দশম পতিরও মৃত্যুর পর কন্যা আগ্রহ করিলে একাদশ বার তাহার বিবাহ দিলেন। সে পতিরও মৃত্যু হইল। অবশেষে হতাশ হইয়া সে পরিব্রাজিকা হইল।"

—কথা সরিৎসাগর তরঙ্গ ৬৬ গাথা।

"মেবারের সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপশালী রাণা হাম্মীর রাজা মালদেবের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই রাণীকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাল বাসিতেন।"

—টডের রাজস্থান।

" 'পরশুরাম ভাই পটবর্দ্ধন' জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কন্যা আট বৎসর বয়সে বিধবা হইল। রাজ-

পণ্ডিত 'রাম শাস্ত্রীর' ব্যবস্থা পাইয়া তিনি সেই বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিলেন।

—মহারাষ্ট্র ইতিহাস।

ইতিহাস ও পুরাণ হইতে এমনি বহুতর প্রমাণ ও উদাহরণ দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে লাভ হইবে কি? যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা কি উহা দেখেন নাই?—নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। তাঁহারা বেশ ভাল করিয়াই জানেন, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে—কেবল বর্ত্তমান সমাজে বহুল প্রচলিত নহে; ইহা জানিয়াও একমাত্র সংকীর্ণ সংস্কার ও নিজেদের ব্যর্থ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতেই না উহারা এতো সচেষ্ট!

অচলায়তন সমাজের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করিয়া বিদ্রোহী বীর ৺শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ করেন। তার পর আরো বহু বিবাহই হইয়াছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণচন্দ্র, প্রসিদ্ধ লেখক ও ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিধবা বিবাহ করেন। প্রাতঃস্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা, চারুচন্দ্র ঘোষের ভগিনী, ব্রজেন্দ্র শীলের কন্যা—প্রভৃতির পুনর্বিবাহ বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ বিবাহ প্রতিদিন হইতেছে।

যে বিধান বা সংস্কার জাতির প্রয়োজন হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করে—তাহার গতিরোধ কেহ করিতে পারে না। ৮

ইহাই বিপ্লব। বিপ্লব শুধু ধ্বংসই করে না—সৃষ্টির বীজও তাহার মধ্যেই লুকাইত থাকে। যাহা অসুন্দর, অকল্যাণকর তাহাকেই ধ্বংস করিতে হইবে—যাহা মঙ্গলময়, মুক্তির অবিরোধী তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, ইহাই বিপ্লবের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম প্রচার ও প্রবর্ত্তন করিতেই যুগে যুগে মহাপুরুষের জন্ম হইয়া থাকে, অবতারের প্রাদুর্ভাব হয়। এই বিপ্লব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাহারা দাঁড়ায়—চিরকাল তাহারা সহস্রধারা জাহ্নবীর মুখে ঐরাবতের মতোই দূর দূরান্তরে ভাসিয়া যায়।

পার্থসারথী হইতে বর্ত্তমান যুগের মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত এই বিপ্লবের মহামন্ত্রই প্রচার করিতেছেন। যুগ যুগ সঞ্চিত অন্ধকারের অন্তরে অগ্নিশিখা পৌঁছাইয়া দেওয়াই ইঁহাদের ব্রত। তাই মহাত্মা গান্ধী এই বিধবা বিবাহ সম্বন্ধেও বলিতেছেন,—

"......বৈধব্য সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিয়া আমরা মহাপাপ করিতেছি। যদি বিধবাদের সুরক্ষিত করিতে হয় তাহা হইলে পুরুষদেরও কি নিজ ধর্ম্মের বিচার করা আবশ্যক হয় না? যাঁহার মন বিধবা হয় না তাঁহার শরীর বিধবা হয় কি করিয়া? তাঁহার প্রতি তাঁহার পিতার কর্ত্তব্য কি? তাঁহার গলায় ছুরী মারিলেই কি পিতার কর্ত্তব্য পালন করা হইল?

বৈধব্যের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আমি অনেক চিন্তার পর নিম্নলিখিত নিয়মগুলির আবশ্যকতা বিবেচনা করিতেছি:—

(১) কোন পিতা ১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কন্যাকে বিবাহ দিতে পারিবেন না। (২) ১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে যাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং ১৫ বৎসরের মধ্যেই যাহারা বিধবা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া পিতার ধর্ম্ম হইবে। (৩) ১৫ বৎসরের বালিকা যদি বিবাহের এক বৎসরের ভিতর বিধবা হইয়া যায়, তাহা হইলে মাতা পিতার কর্ত্তব্য হইবে তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসাহিত করা। (৪) আত্মীয় স্বজনের প্রত্যেকেরই বিধবাকে সম্পূর্ণ আদর করা উচিত। মাতা, পিতা, শ্বশুর, শাশুড়ী সকলেরই বিধবার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।"

—নবজীবন হইতে।

বর্ত্তমান যুবক বাংলার অন্যতম স্রষ্টা ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন,—

"জোর করিয়া বিধবার বিবাহ দেওয়াও যেমন অন্যায় বিধবার বিবাহ জোর করিয়া না দেওয়াও তেমনি অন্যায়।"

বর্ত্তমান ভারতের জাতীয়তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন,—

" When will that message be fulfilled cried I in the days of my youth. Let me repeat it in the evening of my life. "

[যৌবনে বলিয়াছি—"(বিধবা বিবাহের) এই বাণী কবে

মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।” আজ এই জীবনসন্ধ্যায় সেই কথাই আবার পুনারাবৃত্তি করিতেছি।]

মহাকবি হেমচন্দ্র অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে গাহিয়াছেন,—

ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অইরে !
না হলে এমন দশা নারী আর কইরে ;
মলিন বসন খানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ !
দিবানিশি একি বেশ বার মাস সেই ক্লেশ ;
বিধবার প্রাণে হায় এতই কি সয় রে ;
হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ হৃদয় ;
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয় ;
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারী বধ ক'রে তুষ্ট করে দেশাচার।
এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন,
এদেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ ?
পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে ;
অবলা রমণী বলে এতই কি সয়রে ?
ঈশ্বর থাকেন যদি, করেন বিচার,
করিবেন এ দৌরাত্ম সমূলে সংহার ;
অবিলম্বে হিন্দুধর্ম্ম ছারখার হবে !
হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে !
দেখরে দুর্ম্মতি যত, চির ম্লেচ্ছ পদানত
বিধবার শাপে হায় এ দুর্গতি হয় রে।

কবির এই মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ আজ ভারতের প্রতি গৃহে, প্রতি জনপদে, প্রতি অন্তরের অন্তস্থলে তীব্র আঘাত করুক—সমাজের পাষাণ বুকে চেতনার সঞ্চার করুক।

আর একটা প্রশ্নের উত্তর শেষ হইলেই আমরা বর্ত্তমান পুস্তকের উপসংহার করিব। বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রায়ই শুনিতে পাওযা যায় যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ বিধবা বিবাহ কার্য্যে পরিণত না করিলে তাহারা করে কি করিয়া? এ কথার উত্তর আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী বহু পরিচ্ছেদেই বিষদভাবে আলোচনা করিয়াছি। তবু এস্থানে একটা কথা বলিতে চাই। আজ একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে একজন একনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণই এই আন্দো-লনের স্রষ্টা এবং আর একজন নৈষ্ঠিক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণই সর্ব্ব-প্রথম বিধবা বিবাহ কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। তারপরও বহু ব্রাহ্মণ এ কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন এবং আজো হইতেছেন। কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে অবহিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার বলিতেছি—জাতির এই দুর্দ্দিনে যাহারা আজ পিছাইয়া পড়িবে, তাহারা জাতিদ্রোহী বলিয়াই চিরকাল ইতিহাসে নিন্দিত হইবে; আর বর্ত্তমানের বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাহারা জাতির এই জীবন মরণ সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিবে, ভবিষ্যতের চারণ ও কবি তাহাদের স্মৃতি ও ত্যাগের পূজা করিবেই।

উপসংহার।

এই পুস্তক অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে যদি আর একজন স্বর্গীয় মহাপুরুষের জীবন-পরিচয় একটু আলোচনা না করি। লোকোত্তম শ্রীবুদ্ধ যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইলেও প্রিয়-দর্শন শ্রীঅশোকের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলেই সমস্ত জগতে শ্রীবুদ্ধের বাণী প্রচারিত হইয়াছিল, ঠিক তেমনি মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক হইলেও ভারতবর্ষে এই সমাজহিতকর মহাকার্য্য আজ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে দানবীর লালা গঙ্গারাম মহোদয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায়।

১৮৫১ সালে তাঁহার জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় ১৯২৭ সালে। গঙ্গারাম ১৯১৪ সালে লাহারে সর্ব্বপ্রথমে বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ১১৮১৫টী বিধবার বিবাহ হইয়াছে। সমগ্র ভারতে এই সভার শাখা-সভা আছে ৬৯১টী। ইহা ছাড়া হরিদ্বার, লাহোর, মথুরা ও জয়পুরে বিধবাশ্রম আছে। এই সকল আশ্রমে এ পর্য্যন্ত ১৪৫ জন বিধবা স্থান পাইয়া বিবাহিত হইয়াছেন। এই আশ্রম কয়েকটীর ব্যয় প্রতি বৎসর ২৫০০০৲।২৬০০০৲ টাকা হইয়া থাকে। বিধবার প্রতি ইহার যে স্বচ্ছ ও অনাবিল মমতা ছিল, তাহাই বহু প্রকারে তাঁহাকে অম্লানবদনে অজস্র অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্য

দান কবিত। শুধু তাহাই নহে—তিনি মনে করিতেন, এই সমাজ ও বিধাতার কৃপা এবং স্নেহবঞ্চিত মাতৃজাতির সেবার ফলেই তাঁহার সর্ব্বপ্রকাব উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তিনি জনসাধারণের হিতকল্পে দান করিয়া গিয়াছেন। এই দানবীরের অপরিম্লান যশ-গাথা আজ সারা ভাবতে পরিব্যাপ্ত। বাংলার বিধবা-দের জন্য তিনি সত্য সত্যই প্রাণে বেদনা অনুভব করিতেন।

রাজকীয় কৃষি-কমিশনেব সভ্যরূপে যখন লাল গঙ্গাবাম কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন বর্ত্তমান লেখকেব হাবড়া ষ্টেশনে বহুক্ষণ তাঁহার সহিত আলোচনা করিবাব সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

বাংলার ম্যালেবিয়া, নারীধর্ষণ প্রভৃতি বহু সমস্যাব আলোচনাব পর বিধবাব কথা প্রসঙ্গে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি এই কর্ম্মবীরের কণ্ঠ বেদনার আঘাতে কম্পিত হইতেছিল। তিনি বার বার শুধু একটী কথাই বলিতেছিলেন, "হিন্দু বিধবার দুঃখ দূর করিতে যদি আমাকে সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিতে হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না।" এই বৃদ্ধের সেই সাবলিল ও সতেজ শপথ বাণী আজো শতবার অবসন্ন হৃদয়ে উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া দেয়।

তিনি বলিতেছিলেন,—"বাঙ্গালী হিন্দু যদি তাঁহাদের বিধবা মা ও ভগ্নীর দুঃখ দূর করিতে না পারে,—পাঞ্জাব সাদরে এই মহা কর্ত্তব্য মাথায় কবিয়া লইবে। বিবাহেচ্ছু

শত শত বিধবার স্থান পাঞ্জাবে হইতে পারে ; কিন্তু আমি চাই, বাঙ্গালীই বাংলার ব্যবস্থা করিবে।"

তাঁহার সহানুভূতি ও সাহায্যের কথা প্রস্তাব করিবামাত্র তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—"সে কি কথা মশাই; এই বাংলা আমার কাছে তীর্থস্থান। এই বাংলার এক মহাপুরুষের নিকট হইতেই শিখিয়াছি, কেমন করিয়া হিন্দু বিধবার জন্য কাঁদিতে হয় ; আমি একশবার বলিতেছি, বাংলার জন্য আমি অনেক কিছুই করিতে প্রস্তুত।"

একমাত্র স্যর গঙ্গারামের উৎসাহেই ১৯২৫ সালে কলিকাতায় একটী শাখা বিধবা বিবাহসহায়ক সভা স্থাপিত হয়। এই সভা বর্ত্তমানে বাংলা দেশে প্রকৃতই হিতকার্য্য করিতেছে।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি বিধবার বিবাহ এই সমিতির উদ্যোগে সমাধা হইয়াছে তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ ১৭৩৮ ; ক্ষত্রিয় ১৬৪৮ ; আরোরা ২০৩৭ ; আগারওয়ালা ৯২৫ ; কায়স্থ ৩৩১ ; রাজপুত ৭৪২ ; শিখ ৬২৪ ও আরো ১৪৫১টা বিবাহ হইয়াছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভিতর।

সমিতির কাজ কিভাবে দ্রুত সাফল্য লাভ করিতেছে নীচের হিসাব দেখিলেই তাহা সম্যক উপলব্ধি হইবে।

১৯১৫—১২

১৯১৬—১৩

১৯১৭—৩১

১৯১৮—৪০

১৯১৯—৯০

১৯২০—২২০

১৯২১—৩১৭

১৯২২—৪৫৩

১৯২৩—৮৯২

১৯২৪—১৬০৩

১৯২৫—২৬৬৩

১৯২৬—৩১৭২

এই সমিতির দৃষ্টান্তে এবং বাংলার ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারেব ফলে ইহা ছাড়াও বহু বিবাহ হইয়াছে; বর্ত্তমানে হিন্দু সভার প্রচেষ্টাও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় ২৫ বৎসরের কম বয়স্কা বিধবার সংখ্যা ২০৫৮৯৫; আজ প্রত্যেক হিন্দু যুবককে মনে রাখিতে হইবে, এই দুই লক্ষ বিধবার কঠোর অভিসম্পাত এবং মর্ম্মঘাতী দীর্ঘনিঃশ্বাসই বাংলাকে দিন দিন শ্মশানে পরিণত করিতেছে; ঘাতক সমাজের কবল হইতে ইহাদের উদ্ধার করিয়া সার্ব্বজনীন বিরাট আর্য্যজাতির মহাবাণী ইহাদিগকে শুনাইতে হইবে, ইহাদের অকালশুষ্ক প্রাণের দুয়ারে আশার সামগান গাহিতে হইবে—এই সংসারের তাপদগ্ধ কুসুম-কোরকের মুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। হে বাংলার প্রদীপ্ত যৌবন! নিষ্পেষিতা বিধবা নারী চোখের জলে এই মহা দায়িত্ব তোমার মাথায় আজ তুলিয়া দিতেছে; যুগপুরুষের আদেশ,—তুমি ইহা গ্রহণ কর।

(ক) বিধবা বিবাহ সমস্যার অতি সহজে সমাধান হইতে পারে যদি আমরা চিন্তা করি যে বাংলার কতকগুলি হিন্দু পুরুষ, কন্যার অভাবে বিবাহ করিতে পারে না। নিম্নের এই তালিকা দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

(১৯২১ সালের সেনসাস রিপোর্ট হইতে।)

জাতি	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বারুই	৯৬৫৩২	৮৯৩৩৮
ভুঁইয়া	৩২৯৭৮	২৬৪১০
ব্রাহ্মণ	৭০৯৮১০	৫৯৯৭২৯
চামার	৯২৬৮৮	৫৯৫৮৭
ধোবা	১১৮৮৭৬	১০৮৫৯২
দোসাদ	২৮৩১৪	১১৮০৭
গন্ধবণিক	৭৫০৭৬	৬৬৮১০
গোয়ালা	৩২৩২২৯	২৬০৭৪১
যুগী ও যোগী	৬৮৬১৬৬	১৭৯৭৪৪
কাহার	৭৫৫৪৯	৪৬৩৪৯
মাহিষ্য	১১১৩৬৫৮	১০৯৭০২৬
আদি কৈবর্ত্ত	১৯৮২৭৪	১৮৫৭৭৫
কলু	৫০৪৩০	৪৫৪৭১
কামার	১৩৩৪৯৫	১২৫৩৯২
কায়স্থ	৬৭৮৯০৭	৬১৮৮২৯

জাতি	পুরুষ	স্ত্রীলোক
কুমোর	১৪৬৮৩০	১৩৭৮২৩
কুর্ম্মী	১০৩৫১২	৭৭৯৩৫
ময়রা	৬১৫০৭	৫৭০২৭
মুচী	২২৫০৮২	১৯১৬১২
নমঃশূদ্র	১০১৯০৫৭	৯৮৭২০২
নাপিত	২৩০৫২১	২১৩৬৬৭
নুনিয়া	৩৬৯২৯	২১৮০৩
পোদ	৩০০০৩৪	২৮৮৩৬০
রাজবংশী	৮৯৭০৩৫	৮৩০০৭৬
রাজপুত	৮০৫৩৮	৪৪৯৭৫
সদ্‌গোপ	২৭০২১১	২৬৩০২৫
সাহা	১৮৪১৯০	১৭৫৫৪১
সোনার বেণে	২৫৭৬৩	২০৪৭৮
সূত্রধর	৮৭৬৬১	৮০৯০৬
তাঁতি ও তত্ত্ব	১৬৯৯০১	১৪৯৭১২
তেলি ও তিলি	২০৮১৭৫	১৮৭৭৫১

মনে রাখিতে হইবে এই স্ত্রী-সংখ্যার প্রায় একচতুর্থাংশ বিধবা।

—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বিধবা বিবাহে সরকারী আইন

৪৯ বিধবা-বিবাহ এক্ট্ নং ১৫, সন ১৮৫৬।

ধারা নং ১—হিন্দু বিধবার বিবাহ বৈধ। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইলে সে পৈতৃক সম্পত্তির অনধিকারিণী হইবে না।

ধারা নং ২—পুনর্ব্বিবাহ হইলে, পূর্ব্ব পতির সম্পত্তির উপর বিধবার কোন অধিকার থাকিবে না।

ধারা নং ৩—নাবালক সন্তানযুক্ত বিধবা পুনর্ব্বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, মৃত পতির মাতা, পিতা, দিদিমা বা দাদামহাশয় নাবালকের উপযুক্ত অভিভাবক নিযুক্ত করার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারেন।

ধারা নং ৪—নিঃসন্তান বিধবা মৃত পতির সম্পত্তিতে স্বত্ববান নহে।

ধারা নং ৫—পুনর্ব্বিবাহের পূর্ব্বে বিধবার নিজের কিছুতে স্বত্ব থাকিলে বিবাহের পরও তাহা থাকিবে।

ধারা নং ৬—কুমারীর বিবাহ সময়ে যে মন্ত্রাদি পড়ান হইয়া থাকে, বিধবার বিবাহেও সেই সব মন্ত্রই পড়াইতে হইবে।

ধারা নং ৭—যাহার পতির সহিত সহবাস হয় নাই, এরূপ নাবালিকা বিধবা অভিভাবকের অনুমতি ভিন্ন পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে না। এই বিধি না মানিলে এক বৎসরের কারাবাস হইতে পারে এবং এই বিবাহ নাকচ হইবে।

পতি-পত্নীর সহবাসের পর, সে নাবালিকা থাকিবে না, এবং তাহার নিজ স্বীকৃতি অনুসারে পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে।

ধারা নং ৮—নাবালিকা বিধবা পিতার বিনা অনুমতিতে পিতার অভাবে দাদার, দাদার অভাবে মাতার, মাতার অভাবে অন্য কোন নিকটতম আত্মীয় বা বন্ধুর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিতে পারিবে না। জানিয়া শুনিয়া ইহার বিরুদ্ধে কাজ করিলে দণ্ড জরিমানা ও জেল হইতে পারে।

সাবালিকা বিধবা নিজ ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারে।

পরিশিষ্ট খ

১৯২১ সালের বঙ্গদেশের সেনসাস রিপোর্ট

প্রতি হাজার পুরুষে কত স্ত্রীলোক আছে তাহার তালিকা

বৈষ্ণব	...	১১৬৭	কুম্হার	...	৯৩৮
ভূমিজ	...	১০০৬	আওরী	...	৯৩৬
বাউরী	...	১০০১	শুঁড়ী	...	৯৩১
বাগ্দী	...	৯৯৭	লোহার	...	৯২৮
কৈবর্ত্ত	...	৯৮৫	নাপিত	...	৯২৬
তাম্বুলী	...	৯৮০	বারুই	...	৯২৫
ডোম	...	৯৭৫	রাজবংশী	...	৯২৫
সদ্গোপ	...	৯৭৩	কামার	...	৯২৪

সূত্রধর	...	৯২৩	ধোবা	...	৯১৪
কপালী	...	৯৭২	কায়স্থ	...	৯১১
নমঃশূদ্র	...	৯৬৯	কলু	...	৯০১
হাড়ী	...	৯৬৮	গন্ধবণিক	...	৮৯০
যুগী বা যোগী	...	৯৬৬	ময়রা	...	৮৮৪
বৈদ্য	...	৯৬৫	তাঁতি	...	৮৮১
ক্যাওরা	...	৯৬৩	মুচী	...	৮৪৮
পোদ	...	৯৬১	ব্রাহ্মণ	...	৮৪৫
ভুঁইমালী	...	৯৬১	গোয়ালা	...	৮০৭
সাহা	...	৯৫১	ভূইয়া	...	৮০১
সোনার বেণিয়া	...	৯৫৩	সোনার	...	৭৯৫
পাটনী	...	৯৪৬	রাজপুত (ছত্রী)		৫৫৮
কোচ	...	৯৪১	দোষাদ	...	৪১৭

—প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৩১

পরিশিষ্ট গ

বাংলাদেশের ১৯২১ সালের সেনসাস্ রিপোর্ট

বয়স		বিপত্নীক		বিধবা
০—১	...	৭	...	৪৫
১—২	...	৩৯	...	২৫

বয়স		বিপত্নীক		বিধবা
২—৩	...	১৫	...	১২৪
৩—৪	...	৩৩	...	৩২৫
৪—৫	...	১৩৯	...	৯২০
৫—১০	...	৮৯৫	...	৮৭৫
১০—১৫	...	২৩৭৫	...	৩৬৩২৩
১৫—২০	...	৬৫৬৯	...	৯৬৪৭০
২০—২৫	...	১৭১০৪	...	১৫১০৮৬
২৫—৩০	...	৩৮১০৭	...	২৩০৭৯৩
৩০—৩৫	...	৪৯৭২৬	...	২৬৫৪৮২
৩৫—৪০	...	৫৭৩৩১	...	২৬৪৮৬৯
৪০—৪৫	...	৬৯৮৭০	...	৩২০৯৩২
৪৫—৫০	...	৫৯৮৯২	...	২৩৪২৭৭
৫০—৫৫	...	৭০৪৪৮	...	২৯৮৭২৭
৫৫—৬০	...	৪৪০১০	...	১৫৫৯০৫
৬০—৬৫	...	৬০২৮৫	...	২২৮৩৫৬
৬৫—৭০	...	২৩৭৫৪	...	৭৫৬৭৯
৭০ ও তদূর্দ্ধ	...	৫৫৭৬৫	...	১৫৯৭২২
মোট সংখ্যা	...	৫৫৬৩৬১	...	২৫২৮৮০৩

সূচীপত্র ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ